গন্তব্য

সমরেশ বসু

বিশ্ববাণী প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
মে, ১৯৬১

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
অনাদিনাথ কুমার
উমাশঙ্কর প্রেস
১২ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৮

প্রচ্ছদশিল্পী :
পূর্ণেন্দু পত্রী

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস :

চৈতি
অলিন্দ
রূপায়ণ
জগদ্দল
ত্রিধারা
লগ্নপতি
অগ্নিবিন্দু
অচিনপুর
হ্রেষাধ্বনি
বিষের স্বাদ
অপরিচিত
নাটের গুরু
দুরন্ত চড়াই
অলকা সংবাদ
বারো বিলাসিনী
মাসের প্রথম রবিবার
অন্ধকার গভীর গভীরতর
হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা

সকালবেলা, সাতটা বাজতে সাত আট মিনিট বাকী। সরকারী পরিবহণের বাসটা দাঁড়িয়ে। পশ্চিমে, মনুমেণ্ট, এখন শহীদ মিনা' বলা হয়, যার ছায়া পশ্চিমের মাঠে, ঘাসে—ঘাস উঠে যাওয়া ধুলামাটি লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। চৌরঙ্গি সকালবেলার, এখনো তেমন ভি' বহুল যানবাহনে সরব হয়ে ওঠেনি। অধিকাংশ দোকানপাটের দ' বন্ধ। শো-কেসের আলো নেভানো, এখন অন্ধকার মতো, ঝলক দিচ্ছে না। বড় বড় হোটেলগুলোর সামনে ফাঁকা। সুরেন বাঁড়ুজ্জে চৌরঙ্গির মোড়ে, ট্রাফিক পুলিশ এখনো এসে তাদের জায়গা নেয়নি। গোয়ালারা বড় বড় সুরাটি ভাগলপুরী গাভীর গলার দড়ি ধরে, ঘটি বালতি নিয়ে চলাচল করছে।

কলকাতা, এখনো ঠিক কলকাতা হয়ে ওঠেনি। উঠতে চলেছে। সকাল আটটার মধ্যেই, চেহারা বিলকুল পালটে যাবে। কোনো সন্দেহ নেই। দূরপাল্লার বাস যেখান থেকে ছাড়ে, তার চত্বর থেকে দীঘাগামী বাস ছেড়ে গিয়েছে দশ মিনিট দেরিতে, ছ'টা দশে। আর একটা বাস, বেশির ভাগই যাত্রী বোঝাই হয়ে গিয়েছে। তাদের নানারকম কথাবার্তায়, বাসের ভেতর কলরবমুখর। ছাড়বে সাতটায়। একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়ালো, ঝটপট দরজা খুলে, তড়ি ঘড়ি চারজন নামলো। একজন চল্লিশের কম পুরুষ, স্বাস্থ্যবান, লম্বা লম্বা চুল মাথায়। ট্রাউজারের ওপরে হাওয়াই শার্টের লোমশ বুক খোলা, ডান হাতে ঘড়ি, দাড়ি-না-কামানো মুখ। ব্যস্তভাবের মধ্যেও, খুশি আর উৎসাহী। হাতে একটা অ্যাটাচি। ট্যাকসি থেকে নেমেই, পিছনে

যেতে বললো, 'অনু, তুমি ফুল্লরা আর বুবাইকে নিয়ে বাসে উঠে পড়ো, চোদ্দ পনরো ষোল সতরো—এই চারটে সীট আমাদের। আমি ট্যাকসি ভাড়া দিয়ে, স্যুটকেশগুলো তোলবার ব্যবস্থা করে আসছি।'

অনু, ত্রিশের বেশি না, মাথার চুল খোলা, এখনো একটু ভেজা ভেজা, পিঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমান করে ছাঁটা। কপালে একটু সিঁদুর ছোঁয়ানো—দ্রুত হাতে ছোঁয়ানো, বোঝা যায়। তার হাতে একটি রঙচঙে পাশবালিশের মতো ব্যাগ। প্রথমে বাসের দিকেই যাচ্ছিল, নির্দেশ মতো, যাত্রী ভরা বাসের দিকে, সাতটায় যেটা ছাড়বে। খন আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী।

চৈত্র মাস। আকাশ পরিষ্কার, রোদ ঝকঝকে সকাল। চৌরঙ্গির ওয়, বড় বড় ইমারতের ছায়া এখনো পুব ঘেঁষে। পশ্চিমে সবুজের ঝলক। অনু হঠাৎ থেমে বললো, 'তুমি একলা তিনটে স্যুটকেশ তুলবে নাকি?'

কণ্ডাক্টর দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল, নেমে এলো। বললো, 'কতো বড় স্যুটকেশ, দেখি? ওপরে তুলতে হবে নাকি?'

ফুল্লরা—বছর পঁচিশ বয়স হতে পারে, অবিবাহিতা। মাথার চুল অনুর থেকে আর একটু খাটো, কাঁধের একটু নিচে, খোলা। ভেজা ভাব নেই। ওর কাঁধে একটা চটের বিনুনি করা ব্যাগ ঝোলানো।

বললো, 'দিদি, তুমি বুবাইকে নিয়ে ওঠো, আমি কুমারদার সঙ্গে স্যুটকেশ নিয়ে উঠছি।'

কুমার আবার বলে উঠলো, 'চোদ্দ পনরো ষোল সতরো।'

কণ্ডাক্টর ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনারা উঠে পড়ুন না, বাস ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই। আপনারাই লাস্ট প্যাসেঞ্জার।'

কুমার বললো, 'হ্যাঁ, উঠে পড়ো তোমরা, সাতটা বাজতে বেশি বাকী নেই।'

ট্যাকসি ড্রাইভার পিছনের কেরিয়ারের ঢাকনা খুললো। নিজের

হাতেই চটপট তিনটি চামড়ার স্যুটকেশ নামালো। তিনটিই চামড়ার স্যুটকেশ না, একটা পলিথিনের, চেন দিয়ে মুখ আটকানো। কণ্ডাক্টর বললো, 'এসব ভেতরেই চলে যাবে।'

সে দুটো স্যুটকেশ নিয়ে ওপরে উঠে গেল। তার পিছনে পিছনে অনু আর ফুল্লরা বুবাইকে নিয়ে উঠলো। কুমার ট্রাউজারের হিপ্‌ পকেট থেকে পার্স বের করতে করতে, ড্রাইভারকে বললে, 'মিটারটা দেখুন তো ভাই, কতো উঠেছে।'

বাসের ভিতরে, পাঁচ বছরের বুবাই, ওদের নির্দিষ্ট আসনের, জানালার ধারেরটি প্রথমেই দখল করে নিয়ে, খুদে খুদে দাঁতে, মা আর মাসীর দিকে তাকিয়ে হাসলো। অনু বললো, 'ফুলু, তুই বুবাইয়ের পাশে বোস, তবু জানালার কিছু কাছে হবে।'

ফুল্লরা নাক কোঁচকালো, ভুরু কোঁচকালো, বুবাইয়ের মতো ছেলো, মানুষ হয়ে উঠলো, বললো, 'কেন, আমাদের চারটে সীটের মধ্যে, একা মাত্র জানালা পাওয়া গেছে ?'

কুমার পলিথিনের স্যুটকেশটা আর অ্যাটাচি নিয়ে এগিয়ে এসে বললো, 'হ্যাঁ। একদিকে তিনটে, আর একদিকে একটা। তুমি তোমার দিদি আর বুবাই একদিকে বসো, আমি চোদ্দ নম্বরে বসছি।'

কণ্ডাক্টর স্যুটকেশ দুটো যথাস্থানে রেখে, এগিয়ে এসে কুমারকে বলল, 'টিকেটগুলো দেখাবেন একবার।'

কুমারের হাতেই তখনো পার্স। সে পার্স খুলে, টিকেট বের করে দেখালো। কণ্ডাক্টর হাতে নিয়ে টিকেটগুলো দেখে, বুক পকেট থেকে পেন্সিল বের করে, প্রত্যেক টিকেটে একটা করে দাগ দিয়ে, আবার কুমারের হাতে ফিরিয়ে দিল। ফুল্লরা তখন বিরক্ত মুখে গোটা বাসটার ভিতরে এদিকে ওদিকে দেখছে। বিশেষ করে জানালাগুলোর দিকে। ওর ঠোঁট দুটোকে বিম্বোষ্ঠই বলা যায়, স্বাভাবিক রঙ যথেষ্ট উজ্জ্বল। তবু, ঠোঁটে রঙ বুলিয়ে এসেছে। ডাগর চোখ দুটিতে কালো পেন্সিলও। গলায় কাঁধে এখনো পাউডার লেগে আছে। হাতকাটা জলপাই রঙ

কাঁচুলিকাট ব্লাউজের সঙ্গে, শাড়িটাও মিলিয়ে পড়েছে, এমন কি গলার আর কানের কাঁচগুলোও।

বাসের একদিকে তিনটি আসন পাশাপাশি, আর একদিকে দুটি। মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা। পিছনে, একপাশে লোহার জালের দেওয়ালের মধ্যে, বিবিধ রকমের ব্যাগ স্যুটকেশ। আর একপাশে লেভেটরি। ফুল্লরার নজরে পড়লো জানালার ধারে, একটি মাত্র আসনই খালি। আর সেটা চোদ্দর পাশে তেরো। রীতিমতো অন্যায় আর অযৌক্তিক, ফুল্লরার মনে হলো। বেজোড় সংখ্যার আসন কেন জানালার ধারে পড়বে? ওদিকে সতরো, এদিকে তেরো। বিরক্তিকর। ও জেনে শুনেই, কণ্ডাক্টরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'ওটা কত নম্বর সীট?'

কণ্ডাক্টর বললো, 'নাম্বার থারটিন।'

পিছন থেকে কেউ বলে উঠলো, 'আনলাকি নাম্বার।' তারপরে হাসি।

ফুল্লরা পিছন ফিরে তাকালো। পাশাপাশি তিন যুবক, একসঙ্গেই যাচ্ছে বোধহয়। ওরা সবাই ফুল্লরাকেই দেখছে। ফুল্লরা মুখ ফিরিয়ে নিল, তেরো নম্বর সীটের দিকে তাকালো, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে কুমারের দিকে। কুমার তখন পলিথিনের স্যুটকেশটা সীটের নিচে রাখছে। অনু ডাকলো, 'শোন ফুলু। বুবাই না হয় একটু পরে উঠে যাবে, তুই এখন এখানে এসে বোস না।

ফুল্লরা কিছু বলার আগেই কণ্ডাক্টর তার হাতের ঘড়ি দেখে বললো, 'এই নাম্বার থারটিনই লেট করিয়ে দেবে দেখছি। সাতটা বাজলো, এখনো পাত্তা নেই।'

ফুল্লরার চোখে একটা ঝিলিক হেনে গেল। কুমার বললো, 'ফুলু, এখন তুমি তেরো নম্বরেই বসো না। প্যাসেঞ্জার এলে, ছেড়ে দিও।'

সামনের চালকের আসনে ড্রাইভার উঠে বসলো, জোরে শব্দ করে দরজা বন্ধ করলো। ঘেরা জালের ওপার থেকে, রোগা রোগা ড্রাইভার,

ভিতর দিকে তাকিয়ে, মোটা গমগমে স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'প্যাসেঞ্জার সব এসে গেছে ?'

সামনের দরজা থেকে, বিশ বাইশ বছর বয়সের একটা ছেলে—বোধহয়, সহিস বা ক্লিনার হবে, বললো, 'তেরো নম্বর আসেনি।'

কণ্ডাক্টর বললো, 'আমি আর পাঁচ মিনিট দেখবো, তারপরে ছেড়ে দেবো।'

বলতে বলতে সে পিছনের দরজার দিকে চলে গেল। ফুল্লরা তেরো নম্বর সীটে, জানালার ধারে বসলো, ওর পাশে চোদ্দ নম্বরে কুমার। ফুল্লরার দিকে ঝুঁকে, স্বর নামিয়ে বললো, 'তেরো নম্বরের প্যাসেঞ্জারকে পটিয়ে-পাটিয়ে যদি চৌদ্দয় বসতে রাজী করাতে পারো, তা হলেই হলো।'

ফুল্লরা ভুরু কোঁচকালো, কিন্তু ঠোঁটে হাসির আভাস, বললো, 'পটানো আবার কী ?'

কুমার এক চোখ বুজে, ইঙ্গিত করলো। ফুল্লরা ঠোঁট ফুলিয়ে, চোখের তারা ঘুরিয়ে বললো, 'অসভ্য আপনি।'

কুমার বললো, 'হুঁ, আমি অসভ্য। পটানোটা তো আসলে তোমাদেরই কাজ। একটু চোখ ঘুরিয়ে, ইয়ে করে, হাসি দিয়ে—।'

তার কথার মাঝখানেই ফুল্লরা বলে উঠলো, 'আর প্যাসেঞ্জারটি যদি কোনো মেয়ে হয় ?'

কুমার যেন থতিয়ে গেল, হঠাৎ কোনো জবাব মুখে এলো না। ফুল্লরা খিলখিল করে হেসে উঠলো। পিছন থেকে শোনা গেল, 'আনলাকি।' উদ্দিষ্ট কে এবং উদ্দেশ্য, ফুল্লরা বুঝতে পারলো, মুখ ফেরালো না। কুমারের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললো, 'তখন আপনি পটাতে পারবেন তো ?'

কুমার তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভ হয়ে উঠলো, 'মাথা খারাপ। বরং পাশে বসে যাবে, সেটাই তো ভালো।'

ফুল্লরা ঠোঁট বাঁকিয়ে, গ্রাম্য ভঙ্গিতে বললো, 'মুরোদ।'

রোগা ড্রাইভারের মোটা গমগমে স্বর শোনা গেল, 'কী করবে? সাতটা পাঁচ হয়ে গেল।' কণ্ডাক্টর পিছনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, নিজের কবজির ঘড়ি দেখলো, 'স্টার্ট করুন। এ তো আর প্রাইভেট গাড়ি না, কারোর জন্য বসে থাকা যায় না।'

এঞ্জিন গর্জন করে উঠলো। গর্জন করতেই লাগলো, ছাড়লো না। ফুল্লরার বুক ঢিপঢিপ করছে, আর জানালার বাইরে প্রতিটি লোকের দিকে তাকাচ্ছে। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে আরম্ভ করেছে।

এঞ্জিনের গর্জনের মধ্যে, ড্রাইভারের মোটা গলার চিৎকার শোনা গেল, 'কী হলো?'

ফুল্লনা বলে উঠলো, 'ছাড়ছে না কেন?'

কণ্ডাক্টর ঠং ঠং করে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। বাসটা তৎক্ষণাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। যেন টগবগে ঘোড়াটা ছোটবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছিল। ঝাঁকুনি দিয়েই, বাস টারমিনাসের সীমানা থেকে রাস্তায় চলে গেল।

কুমার বলে উঠলো, 'ফুলু, তোমার ভাগ্যেরই জয় হলো, তেরো নম্বর এলো না।'

ফুল্লরার দৃষ্টি তখনো বাইরের দিকে, বললো, 'দাঁড়ান বাপু, আমার এখনো বুক ঢিপঢিপ করছে।'

গাড়ি বাঁ দিকে মোড় নিয়ে, এগোল, এবং তারপরে আবার বাঁ দিকে। হাওয়ার একটা ঝাপটায়, ফুল্লরার কপালে চুল উড়ে পড়লো। বুবাই ডেকে উঠলো, 'ফুলু মাসী।'

ফুল্লরা বুবাইয়ের দিকে তাকালো। বুবাই হাসছে। অনুও হাসছে। কুমার হাসছে। বাস পুরী চলেছে।

এ সময়ে একটা ট্যাকসি বাসটাকে ওভারটেক করে, প্রায় বাসের সামনে আস্তে আস্তে ব্রেক কষলো। ট্যাকসির ভিতর থেকে একটি হাত বাইরে বেরিয়ে এলো। হাতে একটি বাসের টিকেট, চিৎকার শোনা গেল, 'তেরো নম্বর। প্লিজ, এক মিনিট দাঁড়ান।'

বাস তখন দাঁড়িয়ে পড়ে গর্জাচ্ছে। কণ্ডাক্টর দরজা খুলে দিয়ে বলে উঠলো, 'কী যে করেন আপনারা। তাড়াতাড়ি আসুন।'

কুমার বললো, 'মানে, তেরো নম্বরের প্যাসেঞ্জার?'

ফুল্লরার মুখের আলো নিষ্প্রভ হলো, বিরক্তির স্বরে বললো, 'তা ছাড়া আবার কী। ঠিক এসে গেছে।' বলে ও ওঠবার উদ্যোগ করলো। পিছন থেকে শোনা গেল, 'আনলাকি।' সমবেত হাসি।

কুমার বললো, 'যাচ্ছো কেন, বসো না, দেখা যাক।'

তেরো নম্বর আসনের যাত্রী তখন বাসে উঠেছে। ট্যাকসির পথরোধ অপসারিত। বাস গর্জন করে, ইডেন আর আকাশবাণীর মাঝখানের রাস্তা ধরে ছুটলো।

॥ দুই ॥

তেরো নম্বর আসনের যাত্রী দরজার কাছে। বাস ডাইনে মোড় নিয়ে ছুটেছে। আকাশবাণী ভবন পার, বাঁয়ে অ্যাসেম্বলি ভবন, ডাইনে লাটবাড়ির বাগান। কণ্ডাক্টর তেরো নম্বর যাত্রীর টিকিট দেখে, সামনের দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললো, 'সামনে এগিয়ে যান, বাঁয়ে জানালার ধারে।'

কণ্ডাক্টরের কথা যেন ছিটকে এসে লাগলো ফুল্লরার মুখে, রঙ গেল বদলিয়ে, ভুরু উঠলো বেঁকে, কাজল আঁকা চোখের তারা কোণ থেকে হাসলো একবার কুমারের দিকে, তারপরে তেরোর দিকে। তার আগেই কণ্ডাক্টরের কথা শুনে ওর মেজাজটা চড়ে উঠলো। 'জানালার ধারে!' এতোটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে দেবার কী আছে? তেরো কী অন্ধ? যদিও তার চোখে আঁটা একটা ঢাউস ঠুলি, ফুল্লরা ওর নিজের হালকা আর স্বচ্ছ ঠুলির ভিতর থেকেই দেখতে পাচ্ছিল। তেরোর ঠুলিটা একদম কালো, কিংবা বেগুনিও হতে পারে, মোটের ওপর, তার চোখ দেখবার কোনো উপায়ই নেই। এমন কি চোখের দুপাশও অস্বচ্ছ গাঢ় কাঁচে ঢাকা। যেমন গ্লেসিয়ার দেখতে গেলে লোকে ব্যবহার করে। বাসের মধ্যে এরকম গ্লাস এটে ওঠবার মানে কী? এখানে তো আর রোদ ঝলকানো বরফ নেই। কিন্তু তেরো দরজার কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো কেন? ভাবটা যেন গোটা গাড়ির ভিতরটা সে পুঙ্খানুপুঙ্খ দেখে নিচ্ছে, প্রতিটি যাত্রীর মুখ যেন দেখছে। বিশেষ কারোকে খুঁজছে নাকি? তা না হলে অন্ততঃ মুখোসধারীর মতো, চোখের ঠুলিটা খুলুক!

এই রে! ফুল্লরা মনে মনে চমকে উঠে, প্রায় জিভ কামড়াতে যাচ্ছিল। এর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই, অন্তর্যামীর মতো, তেরো চোখের ঠুলিটা খুলে ফেললো। গর্জিত গাড়ি স্ট্র্যাণ্ড রোডে এসে পড়লো, ডাইনে মোড় নিয়ে ছুটলো হাওড়া ব্রীজের দিকে। এখানে ট্রাফিক পুলিশ ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। ভিড়ও চৌরঙ্গির তুলনায় বেশি। স্বাভাবিক, বড়বাজার সামনেই, এবং 'হাওড়া পুল'। রাস্তার ধারে উপছানো গঙ্গার জলে, স্নান শৌচাদি চলেছে। গাড়ির গতি মন্থর। অনুমান করা যায়, সামনে অনেক গাড়ি। বাসের ইঞ্জিন যেন অধৈর্য প্রতিবাদে গর্জাচ্ছে।

মোটা ভুরুর নিচে, তেরোর কালো চোখ দুটো বেশ বড়, কিন্তু দৃষ্টি যেন বাজপাখির মতো, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু। ডান ভুরুর ওপরেই চুল এলিয়ে পড়েছে। এক মাথা রুক্ষ কালো চুল, মেয়েদের বয়'জ কাট চুলের থেকেও অনেক বড়। গোটা মুখের আর ঘাড়ের পিছনে একটি চুলের চালচিত্র, আর কালো গোঁফ দাড়ি। দাড়ির গুচ্ছ তেমন ঘন না, কিন্তু দেখে মনে হয় কাঁচি পড়েনি অনেকদিন, অবিন্যস্ত, পাকানো। চুলে কোনো সিঁথির ব্যাপার নেই। ওপরের ঠোঁট অনেকখানি গোঁফে ঢাকা পড়েছে। নিচের ঠোঁট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, একটু টেপা, যেন শক্ত হয়ে আছে। দাড়ির নিচেই গলার কিছু অংশ, তারপরেই বুক খোলা, প্রায় চটের মতো মোটা কাপড়ের, জামরঙের পাঞ্জাবি। বোতাম খোলা ফাঁকে স্বল্প রোমশ বুক দেখা যাচ্ছে। কাঁধে গোল লম্বা একটা ব্যাগ। সিন্থেটিক কিছু, প্লাস্টিক বা পলিথিন না, অন্য কিছু, সাদা আর লাল রঙ। কিন্তু পাঞ্জাবির নিচে, নীল জিন কাপড়ের ট্রাউজার। এমন কি ফুল্লরা, তেরোর পায়ের রবার সোলের ফোমের দাড় পাকানো স্ট্র্যাপ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। মনে মনে, ও বিদ্রূপ করে হাসলো। বাঙালী হিপি নাকি? বাঙালী তো বটেই। ফুল্লরার মনে আছে, ট্যাকসি থেকে ভেসে আসা কথা, 'তেরো নম্বর। প্লিজ, এক মিনিট দাঁড়ান।'...

ফুল্লরা ঝটিতি ডান দিকে কুমারের গায়ের দিকে ঝুঁকে একটা চাপ দিল। তেরো এগিয়ে আসছে। চোখে আবার, সামনে পাশে ঢাকা ঠুলিটা এঁটেছে। গাড়ি হাওড়া ব্রীজের মুখে, গর্জন শুনলে মনে হয়, প্রকাণ্ড ঘোড়াটা পা দাপাচ্ছে, মুখ দিয়ে ফেনা ছিটকে বেরোচ্ছে।

কুমার নিচু স্বরে বললো, 'কী হলো, ঠেলছো কেন?'

'তেরো নম্বর আসছে, সরুন, উঠে পড়ি।' ফুল্লরা বললো।

পিছন থেকে শোনা গেল, 'স্‌সে আসিলো।' হাসি, এবং তারপরেই আর একটি স্বর, 'আনলাকি।' সমবেত টলে পড়া হাসি।

কুমার বললো, 'বসো না, এতো নার্ভাস হচ্ছো কেন। আসতে দাও দেখি কি করে।'

তেরো এগিয়ে আসছে, ধীরে, প্রত্যেকটি আসন এবং যাত্রীকে দেখতে দেখতে, সীটের পিছন ধরে, শরীরের ভারসাম্য রেখে। গাড়ি ব্রীজের ওপর। ফুল্লরার গঙ্গা দেখা হচ্ছে না। বাতাসে চোখে মুখে চুল উড়ে পড়ছে, যদিও সামনের দিকে কিছু চুল ছোট করে কাটা আছে।

'ফুলু মাসী, গঙ্গা।' বুবাইয়ের চীৎকার শোনা গেল।

কে যেন বলে উঠলো, 'জয় মা গঙ্গা।'

বিদ্রূপপূর্ণ স্বর, 'ভালোয় ভালোয় পৌঁছে দিস মা।' সমবেত হাসি।

কুমার নিচু স্বরে বললো, 'তেরো নম্বর মেয়ে নয়, এখন তোমারই রেসপনসিবিলিটি।'

'কিসের রেসপনসিবিলিটি?' ফুল্লরা অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ওর দৃষ্টি তেরো নম্বরের এগিয়ে আসা জুতোর দিকে। এই সামান্য ব্যাপারেই, ফুল্লরার বুক ঢিপঢিপ করছে, বাতাসের ঝাপটা সত্ত্বেও মুখে ঘাম জমছে।

কুমার বললো, 'ইয়ের—মানে, এমন একটা দারুন হাসি আর লুক দেবে, আর—।'

'থামুন।' ফুল্লরা কুমারের কথার মাঝখানেই বলে উঠলো, 'ও মেয়ে হবে কেন? দেখছেন না, যে ভাবে সবাইকে দেখছে, নিশ্চয়ই ওর কোনো বান্ধবীর থাকার কথা ছিল। বেচারি! এসে গেল, উঠি।'

কুমার শান্ত ভাবে বললো, 'আরে বসো না, আমি ম্যানেজ করছি। ওর বান্ধবী আসেনি তো কী হয়েছে, আর একটা বান্ধবী পেয়ে যাবে। আমি ম্যানেজ করছি।'

'কুমারদা।' ফুল্লরা নিচু ধমকের সুরে বলে উঠলো।

কিন্তু আর কিছু বলার সময় নেই, তেরো একেবারে কুমারের সামনে। গাড়ি গঙ্গা পার, রেল ব্রীজের দিকে এগোবার জন্য গর্জাচ্ছে। হাওড়া স্টেশনের সামনে থিকথিকে ভিড়। মানুষ এবং সবরকমের যানবাহনের। বাস লরি ট্রাম টেম্পো ঘোড়ার গাড়ি প্রাইভেট আর ট্যাকসি আর রিকশাও। ট্রাফিক পুলিশ যন্ত্রের মতো নির্বিকার। হাত এদিকে দেখাচ্ছে, ওদিকে দেখাচ্ছে। কে কার ঘাড়ে পড়ছে, তা আর দেখবার নেই, কেবল নাম্বারটা টুকে রাখা। নিতান্ত বেগতিক দেখলে, বেদী থেকে অবতরণ করতে হয়।

কুমার উঠে দাঁড়ালো, তেরো নম্বরকে চোদ্দ নম্বর আসন দেখিয়ে বললো, 'বসুন।'

বলে সরে গিয়ে পনরো নম্বর সীট ধরে দাঁড়ালো। ফুল্লরা দেখলো, তেরো তৎক্ষণাৎ বসলো না, সীটের গায়ে নম্বর দেখছে। ফুল্লরার পক্ষে অতঃপর বসে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি ওঠবার উদ্যোগ করে বললো, 'এটা তেরো নম্বর।'

'আহা-হা তুমি বসো না ফুলু।' কুমার বলে উঠলো, এবং তেরোকে চোদ্দ নম্বর সিট দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে বসলে আপনার অসুবিধা হবে?'

তেরোকে চোখের ঠুলির জন্য ছদ্মবেশী মনে হচ্ছে। এবং তার স্বরের বিস্ময়ের সঙ্গে, মুখের অভিব্যক্তির কোনো মিল দেখা গেল না, 'অসুবিধা কেন?' ঠুলির ওপর দিয়ে, কপালে একটা রেখা পড়তে

দেখা গেল, বোধহয় ভুরু কোঁচকালো, এবং তারপরে ঝকমকে সাদা দাঁতে একটু হাসলো, বললো, 'এটা চোদ্দ নম্বর বলে ? অসুবিধা হবে কেন ?'

তেরো নম্বর ঘাড় থেকে ব্যাগটা নামিয়ে হাতে নিল। কুমার এবং অনু আর বুবাইয়ের দিকে একবার দেখলো। কুমারের মতো, অনু তখন বুবাই তেরোকে দেখছিল। তেরো চোদ্দ নম্বর আসনে বসলো। ফুল্লরা লজ্জা আর অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে গেল। ও জানালার দিকে অনেকটা ঝুঁকে গেল, এবং মাথাটা পিছনে হেলিয়ে কুমারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কুমারদা আমি ওখানে যাচ্ছি, আপনিই বরং এদিকে আসুন।'

কুমার ভুরু কুঁচকে, খানিকটা অবাক হবার মতো করে জিজ্ঞেস করলো, 'কেন'। বলে আবার অনুর দিকে তাকালো, এবং সেদিক থেকে তেরোর দিকে।

ফুল্লরার দৃষ্টিও অনুর দিকে, উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হলো। ফুল্লরার মুখে রঙের ছটা—লালচে।

তেরো তাকালো একবার কুমারের দিকে, তারপরে ফুল্লরার দিকে। এবং একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে বললো, 'আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।'

ফুল্লরার মুখের রঙ আর একটু গাঢ় হলো, ও তাকালো কুমারের দিকে। কুমার ঘাড় ঝুঁকিয়ে ঠোঁটের কোণে একটু হাসলো, এবং অনুর দিকে ফিরে তাকালো। অনু হাসলো, তাকালো ফুল্লরার দিকে। হাতের এবং ঘাড়ের ভঙ্গিতে ফুল্লরাকে বসতে বললো। বুবাই ওর সমস্ত দাঁতগুলো দেখিয়ে, এমন খুশিতে হেসে উঠলো, চোখ দুটো ঢাকা পড়ে গেল। ফুল্লরা বাঁ দিকে, জানালার কাছে ঝুঁকে, যতোটা সম্ভব সরে বসবার চেষ্টা করে, বাইরের দিকে তাকালো। কিন্তু কিছুই দেখছে না।

'কপালে অনেক দুঃখ আছে, সেই আনলাকি নাম্বার।'

পিছন থেকে শোনা গেল, এবং সমবেত হাসি হঠাৎ থমকে গেল, কারণ ধমকের শব্দ শোনা গেল, 'কী হচ্ছে কী !'

'তুই চুপ কর, যা করছিস, তাই কর।'

অন্য স্বরে শোনা গেল, এবং সমবেত হাসি এবং নিশ্চিত ঢলাঢলি, হাসি শুনলেই বোঝা যায়, ফুল্লরাব মনে হলো। ওর দৃষ্টি বাইরের দিকে। কিছুই দেখছে না, সবই অর্থহীন ছবির মতো চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। গাড়িটা চলছে গর্জন করে, যেন সবকিছু চুরমার করে দেবে। ফুল্লরার মুখে রঙ খেলা করছে। 'অসভ্য !' মনে মনে বলছে। ভ্রূকুটি করছে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। কুমারদা কি এখনো হাসছেন ? আর দিদি ? আর বুবাইটা ? কী বিচ্ছিরি করে হাসছিল বুবাইটা। ছি ছি! ফুল্লরার মন গাড়ির ভিতরে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে গাড়িটা ব্রেক কষলো, যাত্রীরা সব ঝট্-ঝাঁকুনিতে বেসামাল হলো। পিছন থেকে কণ্ডাক্টরের চিৎকার শোনা গেল, 'এই, এই, ক্যেয়া হোতা হ্যায় ? রাস্তা মে দিল্লাগি হোতা হ্যায় ?' বলেই সামনের দরজার বিশ বাইশ বছর বয়সের ছেলেটাকে চিৎকার করে ডাকলো, 'সে সুদরশনো !'

সামনের দরজার ছেলেটা আওয়াজ দিল, 'হুঁ।'

কণ্ডাক্টর ওড়িয়া ভাষায় কিছু বললো, যা ফুল্লরা বুঝতে পারলো না, কেবল 'প্রায়ভ্যাট' শব্দটি ছাড়া। ইতিমধ্যে ধুলা উড়ে এসেছে, স্পষ্টতঃই, এধুলায় হাওড়ার গন্ধ, এবং দৃশ্য। অতি পরিচিত হাওড়ার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ছোট রাস্তা, উপছানো মানুষ রাস্তার দু'পাশ জুড়ে গাড়ি, দোকানের সারি, নর্দমার ধারে নগ্ন শিশুদের মলমূত্র ত্যাগ, এবং পথচারীরা খুবই নির্বিকার-আর মন্থর, ফুল্লরা এখন বাইরের দৃশ্য দেখছে। পিছনের কণ্ডাক্টরের কথা শেষ হতেই সামনের দরজা খুলে, সুদর্শন যার নাম সে নামতে যাচ্ছিল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। তৎক্ষণাৎ ফুল্লরার নাসারন্ধ্র ফুলে উঠলো, ভুরু কুঁচকে উঠলো এবং মুখটা

জানালার কাছ থেকে কিঞ্চিৎ সরিয়ে এনে নত চোখের পাতায়, কোণ দিয়ে তাকালো। তেরো নম্বর তার ব্যাগের মধ্যে হাত গলিয়ে ঝুঁকে পড়ে কিছু খুঁজছে। গন্ধটা গাড়ির ভিতর থেকেই নাকে এসেছে, অবিশ্যি ছু এক ঝলক, কিন্তু স্পষ্টতঃই রাম-এর। ফুল্লরা গন্ধটা চেনে, বিশেষ করে রাম-এর গন্ধ। বরং হুইস্কি বা অন্য কোনো মদের গন্ধ ঠিক চিনতে পারে না। বীয়রটা একটু পারে। কুমার মাঝে মাঝে রাম পান করে। হুইস্কিই বেশি, দিনের বেলা কোনো কোনো দিন বীয়র। তবে খুব কম। দিনের বেলা ড্রিংকের পাট বিশেষ থাকে না, ছুটির দিন কখনো সখনো। রাত্রির দিকে প্রায়ই—রোজ না হলেও, প্রায় রোজ। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, ওর বা দিদি অনুর যে কোনো পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করা হয়নি, তা না। অবিশ্যি সেই সব দিনে, কুমারের বন্ধুদের সঙ্গে, তাদের পত্নীরাও থাকে, এবং সব মেয়েদেরই কিছু কিঞ্চিৎ নিয়ম-ভঙ্গ ঘটে। কুমারের কোনো কোনো বন্ধু পত্নীর নিয়মভঙ্গটা, যাকে বলে, 'সত্যি হাই!'

কিন্তু বাসের মধ্যে কে বা কারা, এতো লোকজনের মধ্যে এই সাত সকালে পান শুরু করেছে? ফুল্লরার জিজ্ঞাসু মন, নত চোখের কৌতূহলিত দৃষ্টি, তেরোর ব্যাগ হাতড়ানোর দিকে। ব্যাগটার ভিতর থেকে গন্ধটা এলো নাকি? তেরো তার লম্বা ব্যাগের অনেক ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। এবং একটা কিছু টেনে তুলতে গিয়ে, ব্যাগ থেকে যেটা বাইরে পড়ে গেল, সেটা একটা বই। ইংরাজী পকেট বই, ফ্রানজ কাফকার মেটামরফোসিস অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ। তারপরেই তেরোর হাতে উঠে এলো, কোয়ার্টার পাউণ্ডের একটা পাঁউরুটি। সে ব্যাগের মুখে, ডোরাকাটা কোনো জামা ঢাকা দিয়ে, ছু-হাঁটুর মাঝখানে চেপে, বইটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে বসলো।

ফুল্লরা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। বাইরের কিছুই দেখছে না। তেরোর ব্যাগে যদি রাম থাকতো, তাহলে আবার গন্ধ পাওয়া যেতো। কিন্তু ছেলেটা—ফুল্লরার ভাবনা থমকালো। এবং

হঠাৎ-ই ও একবার ডান দিকে ফিরে, তেরোর দিকে তাকালো, মনে মনে ভাবলো ঠিকই ভেবেছে। লোকটা না ছেলেটাই, যতোই গোঁফ দাড়ির জঙ্গল গজাক আর, মাথা ভরতি চুলের গোছা। চুলগুলোব দিকে দেখলেই অস্বস্তি লাগে, এতো ঘন আর বড়। উকুন নেই তো? কিন্তু, ফুল্লরা যা ভাবছিল, ছেলেটা কী এখন পাঁউরুটিটা খাবে নাকি? ও তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েই চোখ পড়ল কুমারের ওপর। কুমার ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে, এবং ফুল্লরার দিকেই তাকিয়ে দেখছে। ওব চোখের স্বচ্ছ গ্লাসের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় মাত্রেই, কুমার অনুর দিকে ফিবলো। অনুও তাকালো, ঠোঁটে চাপা কৌতুকের হাসি।

ফুল্লরা তাডাতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল, ওর মুখে বঙের ছটা লাগছে। হঠাৎ গর্জিত বাসটা আবাব তীক্ষ্ণ আর্তনাদেব শব্দে দাঁড়িয়ে পড়লো, চলন্ত এঞ্জিনের ঝংকারে কাঁপতে লাগলো। আর তৎক্ষণাৎ ওব কোলের ওপব কিছু পড়লো। ফুল্লরা চমকে তাকিয়ে দেখলো, মেটামরফোসিস এ্যাণ্ড আদাব স্টোরিজ, আবছা সবুজ রঙেব সেই বিদঘুটে ছবির মলাট। তেরো বলে উঠলো. 'সরি।' এবং ফুল্লরাব কোলের ওপর হাত বাড়াতে গেল। তার এক হাতে কাগজের মোড়ক খোলা পাঁউরুটি।

ফুল্লরার নাসারন্ধ্র আবার স্ফীত হলো, আবার সেই এক ঝলক গন্ধ! ও তাড়াতাড়ি বইটা তুলে, দুজনের মাঝখানের হাতলের ওপর এগিয়ে দিল। পিছন থেকে ঢলঢলে মোটা স্বর শোনা গেল, 'এখন আমি গান করব।'

আর একজনের স্বর, 'কিন্তু সেই গানটা যেন গাসনে।'

তারপরেই নিচুস্বরে ফিসফাস, এবং সমবেত হাসি, এবং তার মধ্যেই উচ্চারিত হয়, 'এবার দেবে।' তৎক্ষণাৎ হুল্লোড়ে হাসি।

তেরো গোঁফ দাড়ির মধ্যে পাঁউরুটি চেপে ধরলো। ফুল্লরার গা টা কেমন ঘুলিয়ে উঠলো।

প্রথমতঃ গোঁফদাড়ির মাঝখানে, হা-মুখে যেভাবে রুটিটা তেরো নম্বর কামড়ে ধরলো, দৃশ্যতঃ সেটা বিদ্‌ঘুটে। ওর ওপর-পাটির দাঁতগুলো,

পলকের জন্য একবার শানিয়ে উঠলো, তারপরেই একরাশ ঘন কালো গোঁফ দাড়ির মধ্যে নরম রুটিটাকে দেখালো যেন হিংস্র গ্রাসের করুণ শিকার। ফুল্লরার, কেমন যেন গা ঘুলিয়ে ওঠার এটা একটা কারণ। তা ছাড়া এরকম কাঁচা পাঁউরুটিও মোটে খেতে পারে না, ওর গা ঘুলায়। মিষ্টি কিসমিস দেওয়া বনরুটি যদি বা খাওয়া যায়, কাঁচা পাঁউরুটি, তাও মাখন বা জেলি ছাড়া, অসম্ভব।

॥ তিন ॥

গাড়িটা গর্জাচ্ছে, এখনো দাঁড়িয়ে, কাঁপছে। ঠিক যেন রাগে কাঁপছে। সামনে রেলওয়ে সাইডিং, লেবেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ। ফুল্লরার বাঁ গালে রোদ। কিন্তু মাখন বা জেলির কথা, নিশ্চয়ই, তেরোর ভাববার অবকাশই নেই। খাওয়ার ভঙ্গিটা অতি ক্ষুধার্ত, বেশ দ্রুত। দেখলেই বোঝা যায়, ছেলেটা—ছেলেটা? হ্যাঁ, ছেলেটাই তো। ফুল্লরা সেটা আগেই বুঝে নিয়েছে, তেরো একটা ছেলেই। ওর বয়সী হতে পারে—পঁচিশ। কিংবা আরো কম। মেয়েরা চোখে দেখে বয়স ধরতে পারে। ছেলেদের সে-চোখ নেই, অন্য চোখ আছে। ছেলেটা পাঁউরুটি খেতে এতোই মগ্ন, ফুল্লরা বুঝতে পারছে, স্থান কাল সম্পর্কে ওর বিন্দুমাত্র চেতনা নেই। রাম-এর গন্ধটা, ফুল্লরা এখন ধরতে পারলো, গাড়িটা দাঁড়ালেই নাকে এসে লাগছে। তার মানে কী? গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়লেই, পিছনের বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে? কাঁচা পাউরুটি থেকেও, প্রায় এই জাতীয় গন্ধ আসতে পারে কিন্তু সেটা হতো অত্যন্ত হালকা। এরকম নির্ঘাৎ রাম-এর না। তবে গন্ধটা, প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল যখন, তেরো তখন ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়েছিল। তা হোক, রাম-এর সঙ্গে তেরোর কোনো সম্পর্ক নেই। তা হলে গন্ধটা অনেক বেশি তীব্র লাগতো। তা লাগছে না।

গেটের এপারে ওপারে, ইঞ্জিনগুলোর গর্জন, হর্নের চিৎকার হঠাৎ বেড়ে উঠলো। গেট খুলেছে। এটাকেই বোধ হয় শালিমারের গেট বলে। তেরোর পাঁউরুটি শেষ। কাগজের মোড়কটা সে দলা পাকিয়ে

হাত বাড়িয়ে জানালার বাইরে ফেলে দিল। একরম করে মানুষ কখন খায়, কেন খায়, ফুল্লরা কিছু কিছু জানে। সময় নেই, উপায় নেই। অত্যধিক ব্যস্ততা, এবং স্বভাবও কোনো কোনো সময় এর কারণ। এরকম স্বভাব ছিল বিমানের, ফুল্লরাদের সঙ্গে উনিভারসিটিতে পড়তো। বিমান কবি। তেরোর মতো না হলেও বিমান প্রায়ই গোঁফ দাড়ি কামাতো না। চুল ছাঁটতো না, পোশাক-আসাক ছিল অগোছালো। কেন, জিজ্ঞেস করলে একটু অবহেলার হাসি হাসত। এসবের কী গুরুত্ব আছে, এরকম একটা ভাব। কেন? গুরুত্ব থাকবে না-ই বা কেন? ভড়ং। বিমানের চুল গোঁফ দাড়ি, অগোছালো পোশাক আর কবিতা, সব কিছুকেই ভড়ং বলে মনে হতো। চমক। অতিরিক্ত স্মার্টনেসের সঙ্গে, কবিতায় কিছু ভাল্গার কথাবার্তার ব্যবহার। তার সঙ্গে রেভ্যুলিউশন। অন্ততঃ চারজন জনপ্রিয় কবির জগাখিচুড়ি মিশেল। ফুল্লরা অনেকদিন বিমানকে বলেছে, 'এখন যে-রকম ভাবে কথা বলছো, ঠিক এইরকম কথার মতো কবিতা লিখতে পারো না?' কারণ, বিমানের প্রেমের ভাষা ছিল বেশ ঝকঝকে, একটা গভীরতার স্পর্শও থাকতো। নিবেদনের থেকে প্রার্থনার আকুতি, আর হৃদয়ের অনুভূতির সরল প্রকাশ, অকপট ছিল প্রাণের গ্লানির ভাষা! শুনলে, নিরালায় ওর গা ঘেঁষে বসতে ইচ্ছা করতো। আড়ালে, ওর মুখ, বুক থেকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছা করতো না। ও তা বুঝতো না। ভড়ং করেই গেল। আর ভড়ং, তা সে যে কোনো ব্যাপারেই হোক, সব কিছুর কাল। বাড়ি থেকে খেয়ে না-আসা দোকান থেকে রুটি কিনে খাওয়া - রুটি কেন, অনেক কিছুই, চলতে চলতে, কথা বলতে বলতে খাওয়া, এক ধরনের স্বভাবজাত। কী প্রমাণ করার চেষ্টা থাকে এ সবের মধ্যে? সচ্ছল পরিবারের ছেলে, অর্থাভাব নেই, সময়াভাব নেই, নিজের পড়াশুনা ছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই—কবিতা লেখা আর প্রেম করা বাদ দিলে। কিন্তু তার জন্য বাউণ্ডুলে হবার কোনো দরকার ছিল না। কে বোঝাবে ওকে সে-কথা? ফুল্লরা সেই বোঝাবার পরিশ্রম করতে চায়

নি। সে-পরিশ্রমের একটাই অর্থ। একটাই তার উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সে-অর্থ আর উদ্দেশ্য, ফুল্লরার ছিল না। ফুল্লরা বুঝতে পেরেছিল, বিমানকে সাময়িক ভাবে ভালো লাগাটা, বিমানের অদর্শনেও সারাদিন মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো না। অনেক মুখ ওকে অন্যমনস্ক করতো। কেউ কেউ, বেশ কিছুদিন ওর মনকে বগলদাবা করে রাখতো। এরকম অবস্থায়, বিমানকে বোঝাবার পরিশ্রম করার কথাই আসে না।

পাঁচিলের ধারের বড় বড় গাছের ছায়া পেরিয়ে, খানিকটা গিয়েই গাড়ি একটু ডাইনে ঘুরলো। রোদ সরে গেল ফুল্লরার মুখের বাঁ দিক থেকে। শহর হাওড়ার সেই গন্ধ, ঠাসাঠাসি ভিড় এখন আর নেই। দৃশ্য গ্রামীণ হয়ে উঠছে, এবং গাড়ির ক্রুদ্ধ গর্জন আর তেমন তীব্র বোধ হচ্ছে না। আকাশ বড় হয়ে যাচ্ছে, মাঠ তাকে ছুঁই ছুঁই করছে, গাছপালার ভিড় বাড়ছে, আর এ সবই যেন গাড়ির গর্জনকে অনেকটা শান্ত প্রশমিত করছে।

মেটামরফোসিস অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ, গাড়ি মোড় নেবার সময়েই আবার ফুল্লরার ডান দিকের কোলের কাছে পড়লো। ফুল্লরা তেরোর দিকে তাকালো। তেরো তার ডানপাশে তাকিয়ে, কুমারদাদের দিকে। ফুল্লরার সঙ্গে কুমারের দৃষ্টিবিনিময় হলো। তার হাতে একটা ইংরেজি পত্রিকা, সে ঠোঁট টিপে হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, 'ফুলু, কিছু খাবে?'

ফুল্লরা অবাক ভ্রূকুটি করে কিছু বলতে গিয়েও, বলতে পারলো না। সেই রঙের ছটা, আবার লাগলো মুখে, মনে মনে বললো, 'কী অসভ্য!' কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে বললো, 'না।'

তেরো ঝাঁকড়া চুল মাথাটা ওর দিকে ফেরালো। তার চোখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মুখের মধ্যে কিছু একটা চুষছে মনে হয়। চোয়ালের দাড়ি সেই রকম নড়ছে। ফুল্লরা মুখটা ফিরিয়ে নেবার আগেই, বুবাই বলে উঠলো, 'হ্যাঁ, খাও না ফুলুমাসী। তুমি একটা পেস্ট্রি খাও, আমিও একটা খাই।'

বুবাইটার সেই ছোট ছোট দাঁতে দুষ্টু আর আবদারের হাসি। মনে হলো, ছেলেটাও বাবার মতো,ফুল্লরার পিছনে লাগছে। অনু ততোক্ষণে, নিচু হয়ে, ছোট একটা ব্যাগ তুলে নিয়েছে। ওই ব্যাগের মধ্যেই কিছু শুকনো খাবার আছে। কিছু প্যাকেটে, কিছু একটা টিফিন বক্স-এ। ফুল্লরা বুবাইকে বললো, 'আমার খেতে ইচ্ছে নেই, তুমি খাও।' বলে ভ্রূকুটি চোখে কুমারের দিকে দেখলো। তেরো তখন আবার মুখ ফিরিয়ে, বোধ হয় বুবাইকে দেখছে বা তার ডান দিকে আর কারোকে, বা জানালা দিয়ে বাইরে।

কুমার বললো, 'খাও না ফুলু। মিষ্টি ইচ্ছে না করে, নোন্তা একটা কিছু খাও। সেই তো কোন্ ভোবে তাড়াহুড়োতে একটু চা বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছো।'

ফুল্লরার ভুরুতে যতো ধনুকের টংকার, রঙের ছটাও ততো বেশি লাগছে। তেরো আবার ওর দিকে তাকালো। আশ্চর্য, ছেলেটা কি ফুল্লরাদের কথাবার্তা শুনছে, আর তাকিয়ে দেখছে নাকি? হঠাৎ একটা মিষ্টি গন্ধ ওর নাকে এলো, অনেকটা টফি বা চকোলেট জাতীয়। ফুল্লরা জানে, কুমারের হাসিটা মোটেই সরল না, এবং খাবার অনুরোধটিও নিতান্ত তা না। মোটা ভুরুর নিচে, কালো ঝকঝকে চোখ দুটোর দৃষ্টি আর টেপা ঠোঁটের হাসি ওর ভালোই চেনা আছে। বললো, 'আপনিই খান, আপনার খিদে পেয়েছে।'

কুমারের মুখ কিছুটা ওর বাঁয়ে, এদিকেই ঝোঁকানো। বললো, 'তুমি খেলে আমিও খেতাম।'

একটি রামচিমটি অথবা পিঠে একটি কিল মারা ছাড়া, এ-মুহূর্তে একথার কোনো জবাব হয় না। কিন্তু আপাততঃ তা সম্ভব না। আর আশ্চর্য, তেরো আবার ডান দিকে ফিরে তাকালো।

অনু বলে উঠলো, 'তা হলে খা ফুলু। একটা চিকেন প্যাটিজ নিবি?'

দিদির হাত থেকে তখন বুবাই রঙীন কাগজে মোড়া পেস্ট্রি

নিচ্ছে। বুবাই ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে, ঘাড় দোলালো, চোখের তারা ঘোরালো, বললো, 'খাবে?'

দিদির হাসিতে আপাতঃ কোনো চাতুরি নেই। তা হলে, ফুল্লরার মনে হতো, ওরা সপরিবারে ওর পিছনে লেগেছে। অদ্ভুত ব্যাপার! তেরো ওর দিকে মুখ ফেরালো। ফুল্লরা মুখটা একটু গোছিয়ে নিয়ে, অন্নুকে বললো, 'আগেই তো কথা হয়েছিল, ফার্স্ট স্টপেজে গিয়ে খাবো। তুমি ভুলে গেলে?'

অন্নু বললো, 'তা বলেছিলি। ঠিক আছে।' কুমারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি নেবে নাকি কিছু?'

কুমার বললো, 'থাক।' বলে ফুল্লরার দিকে তাকালো। ঠোঁটে সেই হাসি।//

ফুল্লরা বাঁয়ে, জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। মেটামরফোসিস অ্যাণ্ড·· ওর ডান দিকে কোলের কাছে পড়ে আছে। ওর খেয়াল ঠিক আছে, কিন্তু বইটা ও আগের মতো হাতে করে তুলে দিল না। কেন দেবে? বইটা বারে বারে পড়বে, বারে বারে, ও তুলে দেবে নাকি? ছেলেটার খেয়াল নেই কেন? কিংবা খেয়াল আছে তবু তুলছে না? ফুল্লরা তুলে দেবে বলে? অবিশ্যি এর আগে, ছেলেটা নিজেই হাত বাড়িয়ে, ওর কোল থেকে তুলে নিতে উদ্যত হয়েছিল। ফুল্লরার তখন মেয়েলি অস্বস্তি বা শালীনতায় বেধেছিল, স্পর্শ-বিঘ্নতা যাকে বলে। তেরো এখন ওকে স্পর্শ না করেই বইটা তুলে নিতে পারে। কিন্তু ছেলেটা কেমন? বোকা নাকি। ওরকম করে দেখছিল কেন? যেন হঠাৎ ফুল্লরাদের বিষয়ে খুব সচেতন হয়ে উঠেছে!

'আচ্ছা, ফার্স্ট স্টপেজটা কোথায়?'

ইতিমধ্যেই আবার আকাশটা ছোট হয়ে আসছিল, ঘিঞ্জি রাস্তা বাড়ি ঘর আর ভিড়ের আড়ালে। গাড়ির গর্জনও ক্রুদ্ধ শোনাচ্ছিল। ফুল্লরার চুলের ঝাপটা লাগা মুখে ভ্রূকুটি-জিজ্ঞেস জাগলো? স্বরটা যেন চেনা চেনা—কোনো শেক্সপীয়রের নাটকের চরিত্রের মতো। কে

জিজ্ঞেস করলো, এবং কাকে ? ও খুব আস্তে আস্তে জানালা থেকে, তেরোর দিকে মুখ ফেরালো। তেরোর চোখের ঠুলিটা খোলা। তার কালো উজ্জ্বল চোখের শান্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফুল্লরার মুখের দিকে। মুখে হাসি নেই গাম্ভীর্যও নেই, শান্ত আর নিরাবেগ, যা ওর চোখের সঙ্গে মেলে না। গম্ভীর স্বগতোক্তির মতো জিজ্ঞেস করলো, 'ফার্স্ট স্টপেজটা কোথায়, জানেন ?'

ফুল্লরা তেরোর চোখের দিকে দেখলো, একটু অবাক হলো, বললো, 'শুনেছি, কোলাঘাট।'

তেরো কোনো জবাব না দিয়ে, বেশ দ্রুত ডান দিকে ঘাড় ফেরালো। অনু তখন, হিণ্ডেলিয়ামের ওয়াটার বোটল থেকে, বুবাইয়ের জন্য গেলাসে জল ঢালছে। তেরো কুমারের দিকে ঝুঁকে পড়ে কী যেন বললো। ফুল্লরা অবাক চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কুমার বলে উঠলো, 'আরে নিশ্চয় নিশ্চয়, এতে আর মনে করার কী আছে ?' বলেই ডান দিকে তাকিয়ে বললো, 'অনু, বুবাইয়ের জল খাওয়া হয়ে গেলে ওঁকে এক গেলাস জল দিও তো।'

অনুর হাতের গেলাস থেকে বুবাই তখন চুমুক দিয়ে জল পান করছে। সে তেরোর দিকে তাকালো। তেরোর মুখ থেকে ফুল্লরার দিকে। ফুল্লরার দৃষ্টি তখন কুমারের দিকে, দুজনের দৃষ্টিবিনিময় হলো। কুমারের ঠোঁটে সেই হাসি। অনু গেলাসের অবশিষ্ট জল বাইরে ফেলে. নিয়মরক্ষার্থে একটু ধুয়ে, এক গেলাস জল সাবধানে কুমারের দিকে এগিয়ে দিল। কিছু জল গায়ে আসনে পড়লোই, যা অনিবার্য চলমান গাড়িতে। কুমার তেরোর দিকে গেলাস এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আসুন।'

তেরো গেলাসটা নিয়ে, প্রায় এক চুমুকেই যেন সব জল শুষে নিল। কুমার জিজ্ঞেস করলো, 'আর নেবেন ?'

তেরো কুমারের দিকে ফিরে, অস্পষ্ট কিছু বললো, আর ঝাঁকড়া চুল মাথাটা ঝাঁকালো। ফুল্লরা তেরোর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কুমার

শূন্য গেলাস অনুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আর এক গেলাস দাও।'

ফুল্লরার কানে এলো, ঠিক ওর পেছনের আসনের পুরুষস্বর, 'সে আর আপনি কি বলবেন। আমি তো গোড়া থেকেই টের পেয়েছি।'

আর একটি স্বর শোনা গেল, 'দেশটা রসাতলে গেল। কিন্তু কিছু বলতে যান, আপনাকেই অপমান করে দেবে।'

আগের স্বর 'অপমান? ধরে পেটাবে মশাই।'

কী বলছে, কাদের কথা বলছে? তেরো দ্বিতীয় গেলাস শূন্য করলে, এবং কুমারকে গেলাস ফিরিয়ে দিয়ে, কিছু বললো। কুমার বললো, 'ওরকম হয়।'

তেরো সোজা হবার আগেই, ফুল্লরা সোজা হয়ে বসলো। তার আগেই, কুমারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। পিছনে শোনা গেল সেই সমবেত হাসি, এবং কথা: 'তোর ভাতে কী?'

অন্য স্বর, 'বুকখান জ্বইল্যা যাইতে আছে। আদরির গান শুনবি?'

ভিন্ন স্বর, 'প্যাঁদাবো সুকুমার।'

আবার সমবেত হাসি, এবং আর এক স্বর, 'দে ফ্লাস্কটা, এক চুমুক আমিও দিই।'

ফুল্লরার মনে হলো সবই যেন কেমন রহস্যময় লাগছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠলো, আর একরাশ ধোঁয়া ওর মুখের কাছে, জানালায় ছিটকে এলো। গন্ধ, সস্তা ভাজা তামাকের। ফুল্লরা তৎক্ষণাৎ মুখে আঁচল চাপা দিল। তেরো বলে উঠলো, 'ওহ্, সরি আমি—' কথা শেষ না করে, ফুল্লরার মুখের সামনে বেগুনি রঙের পাঞ্জাবির হাত নড়িয়ে ধোঁয়া ওড়ালো। ফুল্লরা বিস্মিত বিরক্তিতে মুখটা পেছিয়ে নিল। মেটামরফোসিস অ্যাণ্ড... পড়ে গেল আসনের নিচে।

॥ চার ॥

পিছনের আ নের যাত্রী দুজন কাদের বিষয়ে কথা বলছিল? এই অনুসন্ধিৎসু িন্তার সঙ্গেই, ফুল্লরা আসনের নিচে বইটার প ড় যাওয়া দেখলো। লজ্জা পেলো, বিরক্ত হওয়ার জন্য। কারণ তেরো নম্বর আসলে, ভ্ ্যাবশতই, শশব্যস্ত হয়ে, হাত নেড়ে ওর মুখের কাছ থেকে ধোঁয়া সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু গাড়ির ভিতরে, সামনের দেওয়ালে তো বেশ বড় করেই ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, স্মোকিং স্ট্রিক্‌টলি প্রাহিবিটেড। তেরো নম্বর নিশ্চয় ইংরেজি পড়তে পারে? প্রশ্ন বাহুল্য, 'ওহ্ সরি'-তেই বোঝা গিয়েছে, আর সঙ্গের 'মেটামরফোসিস···।' অবিশ্যি, ফুল্লরা ইতিপূর্বেই যেন দু-এক জনকে সিগারেট ধরিয়ে টানতে দেখেছে, নাকি কেবল গন্ধ পেয়েছে? কুমারকে একবারো বাসে ওঠার পর সিগারেট ঠোঁটে নিতে দেখা যায়নি। অথচ তার একটা সিগারেটের পর, আর একটা জ্বলতে বেশি দেরি হয় না, প্রায় চেন স্মোকার। ফুল্লরা কুমারের দিকে তাকালো। কুমার তখন পিছন ফিরে কিছু দেখছে, তার চোখে ভ্রূকুটি অনুসন্ধিৎসা। ফুল্লরাও কুমারের দৃষ্টির লক্ষ্যে পিছন ফিরে দেখতে গেল, আর তখনই ওর নাকে সিগারেটের ধোঁয়া লাগলো। ধোঁয়া তেরোর সিগারেটের ভেবে, আবার সামনে ফেরার আগেই ওর পিছনের আসনের একজনের হাতে, জ্বলন্ত সিগারেট দেখতে পেলো, এবং শুনতে পেলো, 'দেখুন দেখুন, ব্যাপার দেখে বুঝতে পারছেন না?'

ফুল্লরা যাত্রীটির মুখ দেখতে পেলো না, কেবল তার সাদা পাঞ্জাবির

ঢোলা হাতার খানিকটা আর মোটা মোটা আর কালো আঙুলে চেপে ধরা সিগারেটটি ছাড়া। জবাবে, পাশের যাত্রীর স্বর শোনা গেল, 'ও আর দেখবো কি মশাই? সেই কি বলে না, পেটে ভাত নেই, কিসেতে সিঁদুর? এ হচ্ছে সেই ব্যাপার।'

পিছনের অন্য যাত্রীটি কাসি জড়ানো স্বরে, বুক খিল লাগার মতো হেসে উঠলো। ফুল্লবাবু মনে হলো হাসিটা কেমন যেন ভাল্গার। ও কুমারের দৃষ্টির লক্ষ্যে তাকালো, সেই তিন যাত্রী, যাদের নানারকম কথা আর হাসি, প্রায়ই উলসে বা উছলে উঠছে এবং যাদের 'আলোকি' কথাটা একান্তই ফুল্লবাবু উদ্দেশে ইতিমধ্যেই কয়েকবার উচ্চারিত হয়েছে। ওসবে ফুল্লবাবু কিছু যায় আসে না ওরকম তেরছি নজর, হাসি আর ফুটকাটা জীবনে অনেক শুনেছে। একেবারে গায়ে লাগে না, তা বলা যায় না, কিন্তু লাগাটা জানতে দিলেই সর্বনাশ। আগুনে ঘিয়ের ছিটা। এসবকে ওরা বলে ছিড়িক দেওয়া। কিন্তু তিন জনের মধ্যে দু'জন, বেশ বড় মাপের মিলিটারি ওয়াটার বটল নিয়ে টানাটানি আর হাসাহাসি করছে কেন? যে দু হাতে বোতলটা ধরে আছে, সে ঠোঁট টিপে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে, যে টানছে সে বিরক্ত, কিন্তু অনুনয় করে বলছে, 'দে-না মাইরি, এরকম করছিস কেন?'

কুমার আবার সামনের দিকে মুখ ফেরালো, এবং ফেরাতে গিয়েই, ফুল্লবাবু সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখের পাতা কেঁপে কুঁচকে একটি ইশারা করলো সে। তারপরেই হাসি। ফুল্লরা অপ্রস্তুত, আকস্মিক এই ইশারা আর হাসিতে এবং ও আশেপাশের যাত্রীদের বিষয়ে এতো বেশি সচেতন হয়ে ওঠে, ওর ভুরু কুঁচকে উঠলো। বিরক্ত হয়ে মুখ সামনের দিকে ফেরালো। বিরক্তিকর, সত্যি, কারণ কুমারদা কখনো অন্যান্যদের কথা মনে রাখে না। লোকে কতো কী ভাবতে পারে। একবার নামতে পারলে হয়, কয়েক ঘা মারতেই হবে।

ফুল্লরা সামনের দিকে তাকালো, বাঁয়ে মাথা কিছুটা হেলিয়ে। ওর

চুল উড়ছে, গালে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। বৃহৎ চোখ ঢাকা কাঁচের জন্য তাকাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু মনে হচ্ছে, মাথায় একটা রুমাল বাঁধতে পারলে ভালো হতো। নিদেন, ঘাড়ের কাছে মাঝামাঝি, রবারের বাঁধুনি। ও দু হাতে চুল টেনে পেছন দিকে টেনে দিল, দিয়ে একটা আলতো মোচড়ও দিল, যেন উড়ন্ত গোছা একটু স্থির থাকে। আঁচল সরে গেল বুক থেকে, এখন ওর গায়ে রোদ নেই। রোদ বুবাইদের জানালার দিকে। পিছন থেকে হাত এনে, আঁচল টেনে বুক ঢাকতে গিয়ে, নিজের বক্ষান্তরের দিকে ওর চোখ পড়লো। অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। আঁচলটা টানতে টানতেই ও ঝটিতি চোখের পাতা তুলে তেরোর দিকে একবার দেখলো। তেরোর চোখে এখন আবার সেই মুখোশের মতো কালো ঠুলি আঁটা, ওর চুল দাড়ি অল্প উড়ছে। ফুল্লরার মনে হলো, ছেলেটা যেন পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। আসনের পিছনে, হেলান দিয়ে বসা সত্ত্বেও যেন, ওর জায়গার অভাব, তাই বসে আছে সোজা আড়ষ্টভাবে, দু হাত দুই মোটা শক্ত উরুর ওপর। কিন্তু সিগারেটটা গেল কোথায়? এর মধ্যেই একটা পুরো সিগারেট শেষ হবার কথা না। ফুল্লরা অবাক হয়ে, তেরোর মুখের দিকে তাকালো। না, ঠোঁটে নেই। ফেলে দিয়েছে নাকি?

ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠার শব্দ হলো। ফুল্লরা দেখলো, কয়েক সারি এগিয়ে, সামনের ডান দিকে, কাঠির জ্বলন্ত শিখায় সিগারেট স্পর্শ করছে। ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল, বাঁ দিকের সামনের দরজার কাছে। সাহিস বা ক্লিনার, যাই হোক, অল্পবয়সী ছেলেটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, শরীরের খানিকটা অংশ ছাড়া। ধোঁয়া সেখান থেকেই উড়ছে। ধূমপান নিষেধের বহরটা ভালোই চলছে। কিন্তু তেরোর সিগারেট? এখন আর লজ্জা না, তেরোকে বিরক্তি দেখাবার জন্য। মন খারাপ হচ্ছে। তেরো নিশ্চয়ই সিগারেটটা ফেলে দিয়েছে, আর তা ওর মুখ সরিয়ে বিরক্ত হওয়ার জন্যই। অবিশ্যি, ঠিকই, ভাজা তামাকের একরাশ ধোঁয়া হঠাৎ নিশ্বাসে ঢুকতেই, ওর খুব

খারাপ লেগেছিল এবং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যা ঘটবার, তা-ই ঘটেছিল। ফুল্লরা তো প্রস্তুত ছিল না। কুমারের সিগারেটের ধোঁয়াও যদি ওরকম হঠাৎ নিশ্বাসের মধ্যে ঢুকতো, ফুল্লরা ওরকমই করতো। ব্যাপারটা মোটেই ব্যক্তিকে পছন্দ অপছন্দের না।

ফুল্লরা নিজের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেও, ওর মনের রেকর্ড পাক খেতে আরম্ভ করেছে, আর অনিবার্য ভাবেই, বিঁধেছে কাঁটা। ফলে, মন খারাপ, অস্বস্তি তরঙ্গে তরঙ্গে। ওর মনে হচ্ছে, তেবো পাথরের মূর্তির মতো বসে, সামনে পিছনের ধূমপায়ীদের ধূমপান লক্ষ্য করেছে, আর চোখের কোণ দিয়ে ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসছে। অবিশ্যি ছেলেটার ঠুলি আঁটা, গোঁফ দাড়ি ভরা মুখ দেখে, হাসির কথা ভাবাই যায় না এবং চোখের কোণে তাকানোও। বরং ও যেন রেগে গম্ভীর হয়ে আছে, আর এমন একটা উদাসীনতা ওর ভঙ্গিতে, যেন ও বিশেষ রকমেই স্বতন্ত্র।। এ ভাবটা আরো খারাপ, কারণ ধূমপানের মতোই, ফুল্লরার আচরণকেও তুচ্ছ করে দেখছে।

ফুল্লরা তেরোর পায়ের দিকে একবার দেখার চেষ্টা করলো। না, তেবোর সেই ফোম পাকানো মোটা দড়ির মতো জুতো পরা পা দুটো দেখা যাচ্ছে না, সম্ভবতঃ যার নিচে, সিগারেটটা চাপা পড়েছে। ওর কানের ভেতরে ঝাঁজিয়ে, পর্দা ফাটিয়ে দিতে চাইলো বাসের হর্নের হুংকার। যেমন এঞ্জিনের ক্ষ্যাপা গর্জন, তেমনই দৈত্যের হুংকার হর্নে। আর কী লম্বা হুংকার, যেন থামবে না। ফুল্লরা চোখ নবিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। একটা বড় ইংরেজি 'এস' অক্ষরে, দুটো বাঁক। বাসটা এ পাশে ও পাশে প্রায় টাল খেয়ে মোড় নিচ্ছে। ছোটখাটো একটা ভিড় পেরিয়ে গেল পলকেই এবং একটা চিৎকারের অংশ-বিশেষ, 'সালা মেল…।' তারপরেই একটা ছাগলছানা, যেন গাড়ির তলা থেকে বেরিয়েই ধারের দিকে ছুটে গেল। গাড়িটা ডান দিকে মোড় নিয়ে সোজা রাস্তা ধরলো। একটা লাল ঝলক চোখে মুখে শরীরে ছুঁয়ে গেল। অতি লাল-রক্তের মতো, শিমুল বা কৃষ্ণচূড়ার

থেকে গাঢ়, এতোবড় ফুল ঝাড়ালো মাদারের গাছ সচরাচর চোখে পড়ে না। মন্দার—সংস্কৃত, মাদার তার আটপৌরে নাম। কিন্তু তা-ই কী? সংস্কৃত মাদারের শরীর কী কাঁটা ভরা?

আবার দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠার শব্দ, ডাইনে। ফুল্লরা পিছনে হেলে ঘাড় ফেরালো। কুমার সিগারেট ধরাচ্ছে। ছি! সমস্ত ব্যাপারটা আরো খারাপ চেহারা নিল। বিদ্ধ কাঁটাটা এখন অস্বস্তির দ্রুত বেলায়। কুমার ওর নিজের লোক। সেও কি না শেষে সিগারেট ধরালো? তেরো নিশ্চয়ই ওর বিদঘুটে ঠুলির কোণ দিয়ে দেখছে, আর মনটা আরো শক্ত হয়ে উঠছে, আরো স্বতন্ত্রতরো ভাবছে নিজেকে। কুমার ঠোঁট ছুঁচলো করে, ধোঁয়া ফুঁ দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে ফুল্লরার দিকে তাকালো। চোখাচোখি হতেই, সিগারেটের দিকে ইশারা করে দেখিযে জিজ্ঞাসার ভঙ্গি করলো। অসহ্য! সিগারেটটা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। ও সামনের দেওয়ালের দিকে ইচ্ছে করেই তাকালো, নিষেধের বোর্ডটার দিকে, তারপর আবার কুমারের দিকে। কুমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো না, কিংবা ইচ্ছা করেই বুঝলো না, সামনের দিকে দেখলো না। সিগারেটটা তর্জনী মধ্যমা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বিশেষ ভঙ্গিতে ধরা, ঠোঁটে হাসি।

ফুল্লরা ঠোঁটে ঠোঁট টিপে চোখের পাতা কুঁচকে একটুও না হেসে, কুমারের দিকে দেখলো। তারপরে দিদির দিকে তাকিয়ে দেখলো, রঙীন পত্রিকাটা ও দেখছে। বুবাই বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর ভুরু পর্যন্ত কপাল উড়ন্ত চুলে ঢাকা।

তেরো অনায়াসেই সিগারেট টানতে পারতো। আসলে সে হাতটা মুখের কাছে তাড়াতাড়ি তুলে এনেছিল বলেই তো, ফুল্লরা বেশি বিরক্ত হয়ে, মুখটা সরিয়ে নিয়েছিল। সামনের আসনের জানালার ধারের লোকটি ঘুমোচ্ছে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। মাথা একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে ঢলে পড়ছে।...অথচ তেরো কুমারের কাছেই জল চেয়ে ফুল্লরার দিদির দেওয়া গেলাসে পান করেছে। সিগারেটের ব্যাপারে

এতোটা সিরিয়স হয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না···কিন্তু যারা এরকম গাড়িতে যেতে যেতে ঘুমে ঢলে পড়ে, দেখা যায়, তারা সব সময়েই তার পাশের লোকটির গায়েই ঢলে পড়ে। যেন, ঠিক পাশের লোকটার গায়েই ঘুমের শয্যার চুম্বক লেগে থাকে। কেন? এখনো ঠিক সেইরকমই ঘটছে। পাশের ডান দিকের লোকটি মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। আর ঘুমে ঢুলুঢুলু মাথাটা তার ঘাড়ের ওপরেই বারে বারে গিয়ে পড়ছে। বাঁয়ে, জানালাব ওপরেও পড়তে পারে। বাতাসে নিশ্চয়ই ধাক্কা দিয়ে ডাইনে সরিয়ে দিচ্ছে না। খবরের কাগজ পড়ুয়া যাত্রীটি কাঁধ উচু করে, যথেষ্ট ভদ্রতা বজায় রেখেই ঘুমন্তর মাথা সরিয়ে দিচ্ছে। তার বেশি কিছু না, একরকম যেন অভ্যাসবশতই। যথেষ্ট ধৈর্য আছে বলতে হবে। কিন্তু, মেটামরফোসিস···এর কী হবে? ওটা কি ফুল্লরার পায়ের কাছেই পড়ে থাকবে নাকি?

ফুল্লরা কোমরের আঁচলটা কিছুকিঞ্চিৎ সাব্যস্ত করার চেষ্টাতেই যেন, নিজের কোলের দিকে তাকালো। ফলে, মেদহীন খোলা পেটের ওপর থেকে শাড়ি সরে গেল। ও তা লক্ষ্য করলো না, আসলে দেখবার চেষ্টা করলো বইটা, পায়ে ঠেকছে কী না? না ঠেকলেও প্রায় পায়ের কাছে। ও পাটা একটু সরিয়ে নিল।

হঠাৎ পুরুষের হোহো হাসির সঙ্গে, স্ত্রী-গলার হাসি, কিছুটা নিচু-ধাপে শোনা গেল। ফুল্লরার প্রথমে মনে হলো, দিদি আর কুমারদা। আসলে তা না, ডান দিকের কয়েক সারি এগিয়ে, একটি আসন থেকে তিন জনেই হাসছে। তাদের বসাটা বেশ কৌতূহলী করে। নিম্ন ত্রিশ, নাতিদীর্ঘ পুষ্ট শরীর, ছোট গলা, আঁট বাঁধাকপির মতো খোঁপা মহিলাটির দু'পাশে দুজন পুরুষ। একজনের ধুতি পাঞ্জাবি, ছোট ছোট ধূসর চুল, আর একজনের হাইনেককলার শার্ট, কলারের উপর দিয়ে বেয়ে পড়া লম্বা লম্বা কালো চুল, (অবিশ্যি তেরোর মতো না, তেরোর ঘাড়ের কাছে চুল আরো বেশি ঘন আর কোঁকড়ানো।) চওড়া শক্ত

কাঁধ। হাসির ইতিমুহূর্তেই মহিলার স্বর শোনা গেল, 'এই চুপ! কী হচ্ছে!'

তৎক্ষণাৎ পুরুষ দুজনের হাসি থেমে গেল, মন্ত্রের মতো। কারোরই মুখ দেখা যাচ্ছে না। বাঁ দিকে, লম্বা চুল শার্ট গায়ে পুরুষের মুখ ডাইনে, একটু নিচে ঝোঁকানো, বেশ একটা নিবিড়তা আছে ভঙ্গিতে। বোঝা গেল, সে বলছে, 'কিন্তু যাই বলো, সতরো নম্বরের নিচেরটায়—আমি তো—।' কথাটা পুরো শোনা গেল না, মহিলার শরীরে যেন একটু বেশি ঝাঁকুনি লাগলো। লম্বা চুল শার্ট গায়ে, দুহাতে মুখ ঢাকলো। হাসছে বোধ হয়। কারণ, ধূসব চুল পাঞ্জাবি গায়ে, বাঁ দিক ফিরে তাব দিকে তাকিয়েই হাসছে। মহিলার মাথা অনেকটা পিছনে হেলানো। এমন না কী যে, ফুল্লবা কখনো সিগারেট মুখে নেয়নি, তার স্বাদ ওব জানা নেই। অতি বিশ্রী স্বাদ। অতএব, ওর এমন কোনো তোলো মুখ মেমসাহেবি দাবি নেই, সামনে কেউ সিগারেট খেলে, অনুমতি চাওয়ার কেতা দেখাতে হবে। দেখালে ভালো, অনুমতি দিয়ে কৃতার্থ করা যায়। না চাইলেও ক্ষতি কী? কিন্তু—আচ্ছা, তেরো আসলে ঘুমোচ্ছে না তো?

'আপনি আমাকে আর কী বলবেন, আমি জানি না?' পিছনের যাত্রীর স্বব। 'আমার সব দেখা আছে। কী মেয়ে, আর কী ছেলে। তা এ তো আবার সব আমোদ-সফরে বেরিয়েছে।'

অন্য জনের জবাব, 'তা অবিশ্যি ঠিক। কিন্তু গায়ে যে জ্বালা ধরে যায়। সামনে বসে যা খুশী তা-ই করবে? কিছু বলা যাবে না? আমরাও তো বেড়াতে বেরিয়েছি।'

'আপনি তো মশাই ওল্ড হ্যাগার্ড।' আর এক স্বর, 'আপনি আবার কী বলবেন, আমিই বা কী বলবো? আপনি তো পাড়ায় অনেক কিছু দেখেন, বলতে পারেন?'

অন্য স্বর, 'পাড়া? মশাই পাড়া তো দূরের কথা, ঘরেই কি মুখ খোলা যায়?'

কাসি জড়ানো হাসি, যেন অতি আক্ষেপজনিত এক ধরনের লহরা-বিশেষ এবং তার মধ্যে কয়েকটি কথা ফাঁকে ফাঁকে শোনা গেল, 'বা-বাঘের ঘরে ঘো-ঘো-ঘো-গে-র বাসা।'

'ওঁমম্‌ম্‌ম্‌!'···একটা গোঙানি, তারপরেই, 'আর একটু মাইরি—স্বপন।' তারপরেই, 'আহ্‌, ভারি খচ্চর আছিস তুই বানচ্যত্‌! গু খা শালা।'···

তারপরেই সমবেত হাসি। কথাগুলো ফুল্লরার কানে যেন বিঁধে গেল, খুব কৌতূহল হলেও ফিরে তাকাতে পারলো না কিছুতেই। তবু একবার চোখের কোণ দিয়ে কুমারের দিকে দেখলো। কুমার পিছন ফিরেই দেখছিল, মুখটা এইমাত্র ফিরিয়ে নিয়ে অনুর দিকে তাকালো। অনুও তাকিয়েছিল কুমারের দিকে। কুমার সম্ভবতঃ নিঃশব্দে কিছু ইশারা বা ইঙ্গিত করলো। অনু ভ্রূকুটি করে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, একটু নাক কুঁচকে, আবার কোলের ওপর রঙীন পত্রিকার দিকে চোখ দিল। বুবাই এখন তন্ময় হয়ে বাইরের দিকে দেখছে, ওর ঘাড় থেকে বুক অবধি রোদ।

'আদরির কথা কই, শুন মন দিয়া / শুন মন দিয়া ওগো, যতেক আবিয়াতো মাইয়া!···অনেকটা প্যাঁচালীর সুরে, পিছন থেকে শোনা গেল।

বাধা দিল কেউ, 'ভালো হচ্ছে না সুকুমার, চুপ কর বলছি।'

সম্ভবতঃ সুকুমারই, সম্ভবতঃ, কারণ স্বরটা যেন নানান সুরে খেলছে, 'তোমাদের শালা জানি। এখন শকুন্তলার গান এমনি করেই গাইতাম, নয় তো বিদ্যাসুন্দরের গান, তা হলে খুব ভাল লাগতো। আর আদরির কাহিনী রিয়্যাল সয়েল থেকে এসেছে কী না, খুব খারাপ লাগছে।'

বাধার অন্য স্বর, 'তোমাকে আর সয়েল দেখাতে হবে না।'

তথাপি, নিশ্চিতই সুকুমারের গলা শোনা গেল, 'হায় কি কমু রূপের কথা—হায় আদরির রূপের কথা/দিনে দিনে বাড়ে য্যান্‌ চান্দের ছটা।'···

'চুপ! সুকুমার।' এই স্বরের সঙ্গে সঙ্গেই, গানের মুখেই যেন ঝাপটা পড়ে গেল। তারপরে গোঙানি এবং গোঙানির মধ্যেও, কথার মতো কিছু শোনা গেল, তারপরে সমবেত হাসি।

তেরো পাথরের মূর্তির মতো, অভঙ্গ বিভঙ্গ। ঘুমোচ্ছে? এরকম একটা অখণ্ড স্বতন্ত্রতা—একে কী বলে? রেকর্ড ঘুরতে থাকলে, আর কাঁটা তার বুকে বিঁধে গেলে কী হতে পারে, ফুল্লরা তার প্রমাণ, কিন্তু ফুল্লরা তা জানে না। ও মুহূর্তেই একটা সিদ্ধান্ত নিল, আর ডান দিকে ফিরে বললো, 'আপনার বইটা নিচে আমার পায়ের কাছে পড়ে গেছে।'

তেরো খুব অল্প বাঁ দিকে ঘাড় ফেরালো, যেন সূচিবিদ্ধ হয়ে ও বসেছিল, এমনই ঝটিতি জাগ্রত ওর ভঙ্গি। ওর স্বর শোনা গেল, অবিকল সেই শেক্‌সপীয়ারের নাটকের অভিনেতার মতো, দূরাগত গম্ভীর কিন্তু নিচু, 'জানি। গাড়িটা যখন স্টপে গিয়ে দাঁড়াবে, তখন তুলে নেবো। এখন অসুবিধে হচ্ছে।'

তেরোর কথা শেষ হতেই, বুবাইয়ের চিৎকার শোনা গেল, 'ওই যে —ও—ই যে, রূপানারায়ণ!'···

ফুল্লরা জানালার দিকে তাকিয়ে, রূপনারায়ণের জলে রোদের রেখা দেখতে পেলো।

॥ পাঁচ ॥

বাতাসের ঝাপটা যেন অতিমাত্রায় উতলা হলো, রূপনারায়ণের বাতাস, সাবা গাড়িটার মধ্যে ঢুকে তোলপাড় করে দিল। উড়িয়ে নিল বুকের কাপড়, ফুল্লরার মতো অনেকের। কিন্তু আঁচলটা যে তেরোর মুখের কাছে উড়ে যেতে পারে, ফুল্লরার তা খেয়াল নেই, ও রূপনারায়ণ দেখছে। নদীর ওপারে, একটু দূরে, ওরই দিকে, কোলাঘাটের ইরিগেশনের বাংলোটা দেখাচ্ছে ছবির মতো, ওর ধারণা ওটা কারোর বাড়ি; মনে মনে বললো, 'ইস্! কী সুন্দর বাড়ি! সবুজ মখমলের মতো মাঠটা।'

তেরো যতটা সম্ভব ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, আঁচলটা ওর ঘাড়ে আর দাড়িতে ঝাঁপাঝাঁপি করছে। ফুল্লরার একটা অনুভূতি হলো, ব্রিজের ওপর দিয়ে, গাড়িটা যেন শূন্যে উড়ে চলেছে। হাওড়া থেকে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করছে গাড়ি, ফুল্লরা সেটাও জানে না। ব্রিজ পার হয়ে যেতেই, বাতাসটা ঝপ্ করে পড়ে গেল। বুবাইয়ের চিৎকার শোনা গেল, 'একি বাবা, গাড়িটা দাঁড়াচ্ছে না কেন?'

ফুল্লরা ডান দিকে ফিরে তাকালো। কুমার বললো, 'দাঁড়াবে, স্টপ আসুক।'

বুবাই তা মানতে রাজী না, অভিযোগের সুরে চিৎকার করে বললো, 'বারে, তুমি যে বলেছিলে, কোলাঘাট রূপনারায়ণ নদীর ধারে?'

কুমারের মুখে বিরক্তি আর অস্বস্তি মেশানো হাসি, যা সে বিনিময় করলো অনুর সঙ্গে।

ফুল্লরা স্পষ্ট দেখতে পেলো, দিদির মুখেও বুবাইয়ের জিজ্ঞাসাই, কিন্তু সেটা দিদির মতোই, এবং ফুল্লরারও একই জিজ্ঞাসা। ওরও ধারণা ছিল, কোলাঘাটের স্টপেজ মানে, রূপনারায়ণের ধারে। অথচ বাসটা এখনো গর্জন করে, দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে, নদী পড়ে রইলো অনেক পিছনে।

কুমার বললো, 'রূপনারায়ণের ধারে মানে কী? একেবারে নদীর ধারে তো দাঁড়াবে না। যেখানে বাসের স্টপেজ আছে, সেখানেই দাঁড়াবে।'

বুবাই রীতিমতো অভিমান করে, অবিকল ওর মায়ের মতো বললো, 'ধেত্‌, তুমি বড় বাজে কথা বলো। আমার একটুও ভালো লাগে না।'

ফুল্লরার দিকে কুমার তাকিয়ে, অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল, চোখের পাতা বড়ো করে, বুবাইয়ের দিকে ইঙ্গিত করলো। ফুল্লরা জোরে হেসে উঠতে গিয়ে, মুখে হাত চাপা দিল। ওর বাঁ দিকের গাল চুলে অনেকখানি ঢাকা। কুমারের দৃষ্টি তখনো ওর দিকে। কোনো ইঙ্গিত নেই, যেন খুব অবাক হয়ে, ফুল্লরাকে দেখছে। ফুল্লরার ভুরু কুঁচকে উঠলো। কুমারের চোখের দিকে ভালো করে দেখলো, এবং তারপরে নিজের বুকের দিকে। ওর মুখে ঝটিতি রঙের ছোপ লেগে গেল, তেরোর কোলের কাছে পড়ে থাকা আঁচলটা তাড়াতাড়ি টেনে বুকের ওপর ঢাকা দিল, দিতে দিতেই এক পলকে তেরোর দিকে দেখে নিল। কালো ঠুলির দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝবার উপায় নেই। কেন যে লোকে এরকম বিশ্রী নিকষ কালো ঠুলি পরে? কী ধরনের লোকেরা এসব পরে? কিন্তু ও কুমারের দিকে তাকালো না, বরং মনে মনে বললো, 'পাজী!' এবং বাইরের দিকে তাকাতেই, বাসটা একটা দমকা দৈত্যের নিশ্বাস ফেলার মতো শব্দ করে থেমে গেল। পিছন থেকে ঘোষণার ভঙ্গিতে শোনা গেল, 'কোলাঘাট। দশ মিনিট থামবে।'

গাড়ির ভিতরে সবাই যেন একসঙ্গে উঠে হুড়মুড় করে দরজার

দিকে ছুটলো। যদিও প্রকৃতই তা না। কেউ কেউ হুড়মুড় করে নামলো। একজন চিৎকার করলো, 'এই সুকুমার ওরকম ছুটছিস কেন ?'

জবাব শোনা গেল, 'ওরে বাপ্‌রে, আমার ব্লাডার ফেটে যাবার যোগাড় হয়েছে।'

হাসি শোনা গেল, এবং সেই সঙ্গে, 'শালা ম্যাক্সিমাম্‌ টেনেছে। ব্লাডারের আর দোষ কী ?'

ফুল্লরার কানে কথাটা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হলো, ম্যাক্সিমাম্‌ টেনেছে। কথাটা কুমারদাদের ড্রিংক টেবিলের আসরেও শোনা যায়। তার মানে, তা হলে, রাম-এর গন্ধটা ওখান থেকেই আসছিল।

'গরম সিঙাড়া জিলিপি রসগোল্লা সন্দেশ আছে দিদিমণি, দেবো ?' ফুল্লরার জানালার ঠিক নিচেই, একটি খালি পা, হাফপ্যান্ট পরা ছেলে, ওর দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করছে।

ফুল্লরা কুমারের দিকে চোখ ফেরাতে গিয়ে, হঠাৎই যেন একটা শূন্যতা বোধ করলো। তেরো নম্বর কখন নেমে গিয়েছে, খেয়ালই করে নি। ও জানতো, ওকে একটা বাধা ডিঙিয়ে ডান দিকের আসনের দিকে তাকাতে হবে। ও দেখলো, কুমার তেরো নম্বর আসনের হাতল ধরে, ওর দিকেই ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুবাই আর অনু আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কুমারের চোখে সেই পাজীর হাসি, গা জ্বালানো, বললো, 'দেখতে পেলে ?'

ফুল্লরা অবাক, ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করলো, 'কাকে ?'

কুমার বললো, 'তোমার পাশের লোকটিকে ? এইমাত্র তো নেমে গেল।'

ফুল্লরা নিচু ধমকের সুরে বললো, 'আমি মোটেই পাশের লোককে দেখছিলাম না।'

'তবে বাইরের দিকে তাকিয়ে এতো করে কী দেখছিলে ?' কুমার কপট বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো।

ফুল্লরা বললো, 'আমি মোটেই কারোকে দেখছিলাম না। আমি আপনার মতো না, সকলের সব কিছু দেখে বেড়াবো।'

কুমারের ভুরু কুঁচকে উঠলো এবার, চোখে জিজ্ঞাসা, আবার পলকেই ঠোঁটে হাসি ফোটে।

ফুল্লরার মুখে রঙ। আসলে ও স্খলিত আঁচলের কথাটাই কুমারকে বলছিল। কুমার বললো, 'আমি বুঝি সব কিছু দেখে বেড়াই লোকের দিকে চোখ পড়লে আমি কি করবো?'

ফুল্লরা মুঠি পাকিয়ে হাত তুললো। কুমার তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, চলো অনু, নিচে গিয়েই খেয়ে আসি। বুবাই এসো। এসো ফুল্লরা।'

অনু বললো, 'আমি তো নামবার জন্য দাঁড়িয়েই আছি। তুমি দেরি করছো।'

ফুল্লরা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'করবে না? তা নইলে আমার পেছনে লাগা যাবে কেমন করে?'

'পেছনে?' বলেই ঠোঁটে ঠোঁট টিপে মুখ ফিরিয়ে একটু এগিয়ে গেল।

ফুল্লরা লাল মুখে অনুর দিকে তাকালো। অনু হেসে উঠে বললো, 'লোকটা ভারি অসভ্য।'

ফুল্লরা বললো, 'খুব মজা! আসলে তো করতে পারো না। দাঁড়াও, পুরীতে একবার পৌঁছুই, তারপরে মজা দেখাবো।'

কুমার পিছন ফিরে ডাকলো, 'কই বুবাই, এসো।' পরমুহূর্তেই তার গলার স্বরে বিস্ময়, 'এ কি, তুমি কাঁদছো নাকি বুবাই? কেন?'

সকলেই বুবাইয়ের দিকে উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। দেখা গেল, সত্যি বুবাইয়ের চোখে জল, ঠোঁট ফোলানো। কান্না কান্না স্বরে ও বললো, 'আমি নামবো না। বিচ্ছিরি এ জায়গাটা, এখানে রূপনারায়ণ নদী কোথায়?'

কুমার তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে এসে, বুবাইয়ের হাত ধরে বললো,

‘ওহ্, তোমার সেইজন্য কান্না পাচ্ছে? কিন্তু কী করবো বাবা বলো, গাড়িটা যে এখানেই এসে দাঁড়ায়। ঠিক আছে, আমি পরে তোমাকে একদিন রূপনারায়ণের ধারে আলাদা করে বেড়াতে নিয়ে আসবো।’

বুবাই বাবার সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু বোঝা গেল, এই মুহূর্তে সর্বোত্তম আনন্দ থেকে ও বঞ্চিত, রূপনারায়ণকে আর দেখা যাবে না। সকলের অনেক আনন্দ, ওর আনন্দ ছিল একটি পুষে রাখা স্বপ্ন, রূপনারায়ণের ধারে ও নামবে।

বাসের পিছনে ফুল্লরা যাবার আগে, পিছন ফিরে তাকালো। সেই তিনজনের দলটি নেই। ওর ঠিক পিছনের আসনেই, দুইজন পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তি বসে আছেন। দুজনের হাতেই, দুটি অর্ধেক খোসা ছাড়ানো কলা, এবং দুজনেই ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে ছিল। ফুল্লরা মুখ ফিরিয়ে, সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সেই আসনের তিনজনও এখন পর্যন্ত নামে নি। মাঝখানে বাঁধাকপির মতো খোঁপা বাঁধা মহিলা, দুপাশে অসমবয়সী দুই পুরুষ। সকলেই কিছু খাচ্ছে, এবং মহিলার গলায় শোনা গেল, ‘উহু, ব্রিজের ওপারে, আসবার সময় ডানদিকে পড়েছে পানিত্রাস, আর পানিত্রাসের পাশেই হলো সামতাবেড়ে। শরৎচন্দ্রের বাড়িটা আছে এখনো; আর সেই মহিলা।’

ফুল্লরা কথাটা শুনতে শুনতে, দরজার কাছ থেকে, মহিলার দিকে একবার না তাকিয়ে পারলো না। বাহ্, মহিলার মুখটি ভারি সুন্দর তো। একটু গোলমতো, মাংস একটু বেশি, কিন্তু প্রায় একজন সিনেমা অভিনেত্রীর মতো অবিকল। সেই অভিনেত্রীই নয় তো? ফুল্লরা নেমে গেল। সামনে অনু বা কুমার বুবাই, কারোকেই দেখতে পেলো না। এপাশে ওপাশে তাকালো, আর তখনই বুবাইয়ের ডাক শোনা গেল, ‘ফুলমাসী, এখানে!’

ফুল্লরা সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো, দোকানের ভিতরে একটা বেঞ্চিতে তিন জনেই বসেছে। দিদি টিফিন কেরিয়ার খুলছে। সামনের নড়বড়ে টেবিলের ওপরে ইতিমধ্যেই কিছু সিঙাড়া আর জিলিপি প্লেটে

পরিবেশিত। বুবাই হাসছে রূপনারায়ণের শোকটা এখন আর নেই-এই ছু মিনিটের মধ্যেই। ফুল্লরার সঙ্গে কুমারের দৃষ্টিবিনিময় হলো। কুমার ঠোঁট উল্‌টে, নৈরাশ্যের ভঙ্গি করলো, ডাকলো, 'এসো।'

কুমারকে মাঝখানে রেখে, অনু আর বুবাই ছু পাশে। ফুল্লরা ভুরু কোঁচকাতে গিয়েও, গম্ভীর হয়ে রইলো। কুমারের ইশারাটা বুঝতে ওর অসুবিধা হয় নি। তেরো নম্বরকে কুমার দেখতে পায় নি, ইঙ্গিতটা তারই। তাতে ফুল্লবার কী? ফুল্লরা কি তেরোকে খুঁজছে? তেরোর জন্য মরছে? ও দোকানের মধ্যে ঢুকে, অনুব পাশে বসলো। অনু বললো 'ফুলি, সিঙাড়া আর জিলিপিগুলো বেশ গরম আছে, খেতে আরম্ভ কর।'

বলে, দোকানের একটি ছেলেকে উদ্দেশ করে আবার বললো, 'এই যে, শুনছো ভাই, একটা খালি প্লেট দাও তো।'

ফুল্লরা লক্ষ্য করলো, ছেলেটা দোকানের মালিকের দিকে একবার তাকালো। মালিকও ব্যস্ততার মধ্যে ছেলেটার দিকে একবার তাকালো, এবং বললো, 'দে দে। মায়েদের মিষ্টি-টিষ্টি কি চাই, ছাখ। চা ক' কাপ দিতে হবে, জিজ্ঞেস কর।'

ফুল্লরা বুঝতে পারছে, খাবারের দোকানে বসে, টিফিন কেরিয়ারের খাবার বের করে খাওয়াটা, দোকানদারের মোটেই মনঃপুত না। স্বাভাবিক। তা হলে আর খাবারের দোকানটা আছে কী করতে? ব্যাপারটা কুমারও লক্ষ্য করেছে, সে বলে উঠলো, 'দাদা, কিছু রসগোল্লা এদিকে দিন। আর আপনাদের যা চায়ের কাপ দেখছি, এক কাপে কিছু হবে না। আমাদের আট কাপ চা দিন, কিন্তু চা-টা একটু—।'

'ইস্‌পেশাল!' মূল দোকানী, যে টাকা পয়সা হিসাব করে নিচ্ছে, সে চেঁচিয়ে বললো, 'আট কাপ ইস্‌পেশাল চা ভেতরে।'

অনু বলে উঠলো, 'তা বলে আট কাপ? এতো খাবে কে?'

কুমার বললো, 'আমার একলার জন্যই চার কাপ। তোমার ছুকাপ, ফুল্লরার ছুকাপ।'

'আর আমার ?' বুবাই বলে উঠলো।

কুমার বললো, 'তুমি আমার চার কাপের এক কাপ পাবে।'

বুবাই পোকা-খাওয়া দাঁত বের করে, চোখে ঝিলিক দিয়ে হাসলো। কুমার তাকালো ফুল্লরার দিকে। ফুল্লরা মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে বললো, 'বাপকা বেটা। চা খাওয়া চাই।'

বলে ও মুখ ফিরিয়ে নিল। ফিরিয়ে নেওয়ার ভঙ্গি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইলো, ও এখন কুমারের ওপর চটে আছে।

কুমার বলে উঠলো, 'ফুলু, ওই ছেলে তিনটের কথাবার্তা সব শুনছিলি তো ?'

ফুল্লরা ভ্রূকুটি-অবাক চোখে, কুমারের দিকে তাকালো। কুমার মুখে একটি সিঙাড়া পুরে দিল। অনু বলে উঠলো, 'যাচ্ছেতাই। ছেলেগুলো এসপ্লানেড থেকেই ড্রিংক করতে করতে আসছে। আর কী সব আজেবাজে কথা বলছিল। আমার মনে হচ্ছিল, ফুলুকে নিয়েও ওরা কিছু বলছিল।'

কুমার মুখে চর্বিত সিঙ্গাড়া নিয়ে বলল, 'মনে হচ্ছিল মানে ? রেগুলার বলছিল। বেচারিদের খুব গায়ে লেগেছে, ফুলুর পাশে ওরা বসতে পায় নি। সেইজন্যই বারে বারে আনলাকি থারটিন বলছিল।'

ফুল্লরাও সেটা বিলক্ষণ অনুমান করেছিল। কিন্তু ঠিক ওরাই যে মদ্যপান—রাম খাচ্ছিল তা যথার্থ ধরতে পারে নি। ও একটা জিলিপি হাতে তুলে নিয়ে বললো, 'ওরা রাম খাচ্ছিল, না ?'

কুমার বললো, 'হ্যাঁ। আমার মনে হয়, মিলিটারি ওয়াটার বোটলে পুরো এক বোতল রাম ঢেলে, জল মিশিয়ে নিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, আমিও ওরকম নিয়ে এলে পারতাম।'

ফুল্লরার সঙ্গে অনুর দৃষ্টিবিনিময় হলো। অনু বললো, 'হ্যাঁ, তা না হলে সুবিধে হতো কেমন করে ? তুমি মাতাল হয়ে, যা-তা আরম্ভ করতে, আমাদের দু বোনকে সামলাতে হতো।'

ফুল্লরা বললো, 'আমার বয়ে গেছে। একগাড়ি প্যাসেঞ্জারের সামনে আমি মোটেই মাতাল সামলাতে যেতাম না।'

কুমার চোখ মুখ পাকিয়ে শক্ত করে বললো, 'মাতাল মানে? আমি কখনো মাতাল হই?'

ফুল্লরা আর অনু পরস্পরের দিকে তাকিয়ে, হেসে উঠলো। অনু হঠাৎ চমকে বলে উঠলো, 'এ কি করছিস বুবাই, তুই একলা চারটে সিঙাড়া খেয়ে ফেললি? এই প্যাটিজ কে খাবে?'

কুমার উঠে এসে, ফুল্লরার পাশে বসলো। ফুল্লরা ভুরু কুঁচকে, সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো, নাসারন্ধ্র কেঁপে কেঁপে উঠলো। আসলে, রাগের থেকে, ওর ভয়ই বেশি। কুমার যে কী বলতে পারে, আর না পারে সবই অনুমানের বাইরে। ও বললো, 'কী হলো, এখানে এসে বসলেন কেন?'

কুমার বললো, 'দুদিক থেকে তাপ পাওয়া যাবে। একদিকে তুমি, আর একদিকে অনু।'

ফুল্লরা জিলিপি চিবোতে চিবোতে বললো, 'কেন বউ আর ছেলের তাপে চলছিল না?'

'দাঁড়াও, আর একটু বুড়ো হতে দাও, তারপরে তো ছেলের তাতে তাতবো।' কুমার বললো।

'ফুল্লরা, বললো, 'যযাতি।'

অনু হেসে উঠে, একটি চিকেন প্যাটিজ কুমারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'এখন এটা খেয়ে নিজেকে তাতিয়ে নাও তো।'

ফুল্লরা শব্দ করে হাসলো। কুমার চোখের ভঙ্গি করে বললো, 'খুব যে অ্যাঁ? আচ্ছা, এর জবাব পরে হবে। এখন বলো তো, তোমার পেছনের সীটের বুড়ো দুটোর কথাবার্তা শুনছিলে?'

ফুল্লরা উৎসুক আর অনুসন্ধিৎসু হলো, জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু কিছু। কাদের নিয়ে কথা বলছিল লোক দুটো? মনে হচ্ছিল, খুব রেগে গেছে?'

কুমার বললো, 'কাদের নিয়ে আবার? ওই শ্রীমানদের নিয়েই, যারা ওয়াটার বোটল থেকে রাম্ টানছিল। তাও তো তুমি লোক দুটোর

চোখ মুখের ভঙ্গি দেখনি। ক্ষমতা থাকলে ওরা বোধহয় ছেলে তিনটিকে বাস থেকে নামিয়ে দিতো।'

অনু একটি প্যাটিজ ফুল্লরাকে দিয়ে বললো, 'সত্যি, ছেলেগুলো ভারি অসভ্যতা করছিল।'

'আমার কিন্তু খুব মজা লাগছিল।' কুমার বললো, 'সুকুমার না কি নাম একজনের, যে আহ্লাদীর গান করতে চাইছিল, ওর বন্ধুরা গাইতে দিচ্ছিল না। আমার কিন্তু খুব শুনতে ইচ্ছে করছিল।'

ফুল্লরা ঠোঁটের রঙ বাঁচিয়ে, প্যাটিজে কামড় বসাচ্ছিল। কিন্তু না বসিয়ে, হেসে উঠে বললো, 'আহ্লাদা আবার কোথায় শুনলেন। ও তো আদুরির গান করতে যাচ্ছিল।'

অনু বললো, 'আদুরিও না, আদরি। পুরো বাঙাল উচ্চারণ।'

'আর নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ভাল্‌গার।' ফুল্লরা বলে উঠলো, 'একগাড়ি প্যাসেঞ্জারের মধ্যে ওসব গাওয়া উচিত না।'

কুমার ফুল্লরার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললো, 'পেছনের বুড়ো দুটো কিন্তু তোমাকে—মানে, তোমাদের দুজনকেও খুব লক্ষ্য করছিল।'

ফুল্লরা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, 'তার মানে? আমাকে—আমাদের আবার কী লক্ষ্য করছিল?'

কুমার কোনো জবাব না দিয়ে, চোখের পাতা নিবিড় করে, প্যাটিজ চিবোতে লাগলো। ফুল্লরা ঝেঁজে উঠে বললো, 'কুমারদা ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আমি কী করেছি যে আমাকে লক্ষ করবে?'

কুমার ঢোক গিলে প্যাটিজ গলাধঃকরণ করে বললো, 'তোমাকে না তোমাদের। লক্ষ্য আর কী করবে? এই বইটা পড়ে যাওয়া, আঁচলটা ইয়ে হয়ে যাওয়া—।'

অনু বলে উঠলো, 'বেচারি! বুঝলি ফুলু, তোর কুমারদার হিংসে হচ্ছে। ওই চুলদাড়িওয়ালা ছেলেটাকে, তোর কুমারদার জায়গায় বসিয়ে দিস, আর কুমারদা—'

কুমার বাধা দিয়ে বলে উঠলো অনু, তুমি আমার দল থেকে চলে

যাচ্ছো ? আচ্ছা, তোমার বোনকেই জিজ্ঞেস করো, এদের মধ্যে কোনো কথা হয়েছিল কী না ?'

ফুল্লরা বললো, 'কেন হবে না ? হয়েছিল। ও আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলো, ফার্স্ট স্টপেজটা কোথায় ? আর আমার পায়ের কাছে ওর একটা বই পড়েছিল—এখনো নিশ্চয় পড়ে আছে, কাফ্‌কার মেটামরফসিস অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ, আমি বলেছিলাম, আপনার বইটা পড়ে আছে। ও বললো, পরে তুলে নেবো, এখন অসুবিধে হবে।'

এই সময়ে দোকানের ছেলেটা চা দিয়ে গেল। অনু জিজ্ঞেস করলো, 'কেন, অসুবিধে কেন ?'

ফুল্লরা বললো, 'তাহলে ওকে আমার কোলের ওপর পড়ে বইটা তুলতে হতো, এটাই অসুবিধে।'

বুবাই যে ওদের কথা শুনছিল, কারোর খেয়াল ছিল না। ও বলে উঠলো, 'ফুলুমাসী, তোমার পাশের লোকটা ডাকাত, না ?'

ফুল্লরা হেসে উঠলো। কুমার বললো, 'ওরে সে যে কী ডাকাত। ডাকাতিয়া বাঁশি।'

এবার অনু আর কুমারও জোরে হেসে উঠলো। ফুল্লরা ঘুষি তুললো, আর সেই মুহূর্তেই বাসের হর্নটা যেন ক্ষ্যাপা চিৎকারে ঘন ঘন বেজে উঠলো। তৎক্ষণাৎ একটা তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। কুমার বললো, 'যাহ্‌, দশ মিনিট হয়ে গেল ? নাও নাও, তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নাও।'

একে চা পান করা ঠিক বলা যায় না। কোনোরকমে প্লেটে ঢেলে, অল্পবিস্তর চুমুক দিয়ে, সবাই বাসে গিয়ে উঠলো। শুধু ফুল্লরাদের দলটাই না, বেবাক যাত্রীদের একই অবস্থা। ড্রাইভার ইতিমধ্যে এঞ্জিন স্টার্ট করে দিয়েছে। ফুল্লরা দেখলো, তেরো ওর আসনে আগেই বসে গিয়েছে। ফুল্লরা এগিয়ে আসতে তেরো উঠে দাঁড়িয়ে, ওকে ভিতরে ঢুকতে দিল। গাড়িটা সেই মুহূর্তেই ঝাঁকুনি দিয়ে, চলতে

আরম্ভ করলো। ফুল্লরা আর একটু হলেই পড়ে যেতো, সামনের আসনের পেছন ধরে সামলিয়ে নিল।

বাতাস এখন গরম হয়ে উঠছে। তবু ভালো লাগে। বাইরে রোদের চেহারা যেন আস্তে আস্তে রেগে ওঠার মতো দেখাচ্ছে। তবু ভালো লাগে। দুপাশে সবুজ মাঠ, গাছের পাতায় পাতায় ডালে ডালে দোলাদুলি ঝাঁকাঝাঁকি।

'এখন আর ভুল হচ্ছে না, ফুল্লরা ঘোষ তো ?'

শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের অভিনেতার মতো সেই ভারি আর মোটা গলায়, জিজ্ঞাসাটা শুনে ফুল্লরা হতবাক চোখে, তেরোর দিকে তাকালো। তেরোর চোখের ঠুলি খোলা, ও হাসছে। যেন খুবই চেনাশোনা পরিচিত, এমনভাবে হাসছে।

॥ ছয় ॥

তেরোর মুখ গোঁফদাড়িতে ঢাকা থাকলেও, তার হঠাৎ অনায়াস জিজ্ঞাসা, ওই ভুরু আর চোখ জোড়া, আর নাক আর ঝকঝকে দাঁত-গুলো, কেমন চেনা চেনা ঠেকলো। ফুল্লরার চোখে ভ্রূকুটি-বিস্ময় যদিও, চোখের অনুসন্ধিৎসা বেশ তীব্র। ও চিনতে চাইছে। তবু একটা অবিশ্বাস, একটা সংশয়, ছুঁয়ে থাকছে।

'চিনতে পারা যাচ্ছে না তো? তা হলে আমাকেই বলতে হয়। হঠাৎ চিনে নামটা বলে উঠলে, বিপদে পড়ে যাবো।' তেরো আবার বলে উঠলে, মুখে সেই হাসি। আর সেই স্বর, সেই অভিনেতার মতো, কিন্তু আরো নিচু। ফুল্লরার যে-স্বরকে মনে হয় ক্লাসিক চরিত্রের উপযোগী, ওথেলো অথবা ম্যাকবেথ, এ-ধরনের স্বর ছাড়া মানায় না।

কার এই স্বর? কার? ফুল্লরার পরিচিতদের মধ্যে? এই জিজ্ঞাসাটা তীব্র হতেই, ওর মস্তিষ্কের অন্ধকার ভিতরটা দপ্ করে জ্বলে উঠলো। ওর চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে গেল, মুখ তুলে, ঠোঁট খোলবার উদ্যোগ করতেই, তেরো নিজের মুখের কাছে হাত তুলে, প্রায় চুপিচুপি, বলে উঠলো, 'বলো না বলো না, বুঝেছি চিনতে পেরেছো। নামটা মনে মনেই রাখো।'

ফুল্লরা তবু না বলে পারলো না, আর এত অবাক যে গলা প্রায় রুদ্ধ, 'তুমি! আশ্চর্য! তুমি তো— ।'

'কিছুই না।' তেরো হাসতে হাসতে উচ্চারণ করলো, এবং নিচু স্বরে বললো, 'আমার কথা কিছু আলোচনা না করাই ভালো। এতক্ষণ নিশ্চয়ই আমার চোখের ঠুলিটাকে খুব অসভ্য লাগছিল। এখন

অনুমতি করো তো আবার পরে ফেলি। খোলা চোখে বড় অস্বস্তি বোধ করছি।'

ফুল্লরা বুঝতে পারলো, কমল—এতক্ষণ যে তেরো ছিল, ওর কথায় বাধা দিল। দিয়ে ঠিকই করেছে, কারণ ও যা বলতে যাচ্ছিল, কেউ শুনতে পেলে, কমলের পক্ষে সেটা বিপজ্জনক হতে পারতো। ও বলতে যাচ্ছিল, 'তুমি তো অনেককাল ধরে অ্যাবস্‌কণ্ড করে আছো।' ও বললো, 'হ্যাঁ অস্বস্তি হলে নিশ্চয়ই ওটা পরবে। দরকারও বোধ হয়।'

'সত্যি খুব দরকার।' কমল বলতে বলতে চোখের ঠুলি আঁটলো, ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

ফুল্লরার বিস্ময় কিছুতেই কাটতে চায় না, বললো, 'সত্যি, আমি যেন এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার পাশে তুমি বসে রয়েছো। তুমিই বসেছিলে এতক্ষণ! আর তুমিই যে তেরো—।'

কমল মোটা গলায় শব্দ করে হেসে উঠলো। এবার আর আস্তে না, সহজ স্বাভাবিক স্বরে বললো, 'আমিই যে তেরো, এ নামটাও খারাপ না—তেরো। কিন্তু আন্‌লাকি, পিছনের ফিটারস্‌রা তো তোমাকে অনেকবার শুনিয়েছে।'

ফুল্লরা হেসে উঠে বললো, 'সেটা ঠিক খেয়াল রেখেছ তো? কিন্তু ফিটারস্‌ মানে?' ও ভুরু কোঁচকালো।

কমল হাসলো, ওর কোলের ওপরে রাখা বাঁ হাতের একটা ভঙ্গি করে বললো, 'এমনি বললাম আর কি, ওরা বেশ ফিট করে রেখেছে নিজেদের। ফিট যাকে বলে।' আবার একটু হেসে বললো, 'মেকানিকালি কথাটা ধরো না। আসলে কিন্তু তুমিই তেরো, তাই না?

ফুল্লরা লজ্জা পেলো, মুখে ছটা লাগলো, কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকিয়ে বললো, 'তার মানে আমি আনলাকি।'

'না, লাকি।' কমল বললো, 'জানালার ধারটা তুমি চেয়েছিলে পেয়েছো। এর পরে আর আনলাকি বলা যায় না।'

ফুল্লরা জানে, কুমারদা, দিদি, এমনকি বুবাইটাও এদিকেই অবাক

চোখে তাকিয়ে আছে। কেবল তাকিয়েই নেই, নিজেদের সঙ্গে অবাক দৃষ্টি বিনিময়ও করছে। কেবল কি দৃষ্টিবিনিময়? ইংরেজিতে যাকে বলে, ডায়িং, কৌতূহলে আর বিস্ময়ে মরে যাচ্ছে। বিশেষ করে কুমারদা। মনে মনে বোধ হয় রেগেও যাচ্ছে। ফুল্লরা একবার তাকিয়েও দেখছে না, অথচ চোখে কালো ঠুলি পরা, গোঁফ দাড়িওয়ালা সেই রহস্যময় তেরোর সঙ্গে এখন দিব্যি হেসে কথা বলে চলেছে। তুজনের 'তুমি' সম্বোধনও নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছে, আর কথাবার্তার অন্তরঙ্গ ভঙ্গি। অতঃপর নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করা যায়, ফুল্লবা একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাবে, হাসবে, ঘাড় ঝাঁকিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত দেবে।

ফুল্লরা কিছুই করবে না। মনে মনে বললো, কেন, আরো লাগো আমার পেছনে! ও কমলকে বললো, 'তা সেদিক থেকে লাকিই বলতে পারো। জানালার ধারটা পাবাব জন্য যে কী ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছিলাম! ময়দান থেকে বাসটা ছাড়ার সময়েও তুমি যখন এলে না, আমাব কী একসাইটমেণ্ট! মনে মনে ভগবানকে পর্যন্ত ডেকে ফেললাম, তুমি যেন না আসো।'

কমল হা হা করে হেসে উঠলো, বললো, 'ওহ্! হোয়াট এ উইণ্ডো! এ উইণ্ডো ফর এ কিংডম-এর মতোই! বা এ কুইন কনসরট্।'

ফুল্লরাও প্রায় খিলখিল করে হেসে উঠলো, কিন্তু ও লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। বললো, 'তা যাই বলো, এই লঙ্ জারনিতে একটা জানালা পাওয়া ভাগ্যের কথা।'

'আর ভাগ্যিস আমিই উঠেছিলাম!' কমল বললো।

ফুল্লরা উদ্বিগ্ন স্বরে বললো, 'সেটা তো আরো ভয়। তোমাকে মাঝ-পথ থেকে বাস দাঁড় করিয়ে উঠতে দেখে তো ভাবলাম, জানালাটা গেল।'

'কিন্তু আমি তোমাকে জানালাটা ছেড়েই দিতাম।' কমল বললো, 'আর যাই করি না কেন,' অচেনা হলেও একটি ইয়ং মেয়েকে আমি জানালা-ছাড়া করতাম না।'

ফুল্লরা হেসে উঠতে গিয়ে থমকে গেল, কারণ হঠাৎ পিছন থেকে ছড়া কাটার সুরে শোনা গেল, 'হায় আদরি—আদরি লো এই কি দেখি চক্ষের মাথা খাইয়া/মনমোহন চ্যাংড়া মরে তোর দেখা পাইয়া।'...

ছড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাসি, এবং একজনের প্রতিবাদ, 'শালা, তোর তাতে কী। স্টপ অল্ ইওর আদরি নুইসেন্স!'

তৎক্ষণাৎ আবার ছড়ার সুরে, 'অই আদরি হায় আদরি, কাইল আছিলি ক্যাংঠা ল্যাংটা ছেম্‌ড়ি—।'

মুহূর্তেই আবার বাধা, 'স্টপ সুকুমার, ঝাড় খাবি বলছি।'

জবাবে শোনা গেল, 'তবে আর যাই বলিস আনলাকি বলিস না। তোদের রবিঠাকুরের সেই গানটার পঞ্চদশীকে এখন থেকে ত্রয়োদশী বলিস!'

সমবেত হাসি। ফুল্লরা কমলের দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিল। ঠোঁটে ঠোঁটে টিপে, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ছিল, আর নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছিল। যথার্থ রাগ না, অস্বস্তি বিরক্তি আর এক ধরনের ঠাট্টা উপভোগের মতো, কিন্তু শেষের কথায় ও কমলের দিকে ফিরে বললো, 'কী অসভ্য দেখেছো?'

কমলের দাড়ি গোঁফের ভাঁজে হাসি ফুটলো, খুব নিচু স্বরে বললো, 'মন্দ কী। পূর্ণিমাতে অবসান, ত্রয়োদশীই তো ভালো।'

ফুল্লরা ভ্রূকুটি করলো। কমল হেসে, মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালো। এবার ফুল্লরার চোখ পড়লো কুমারের দিকে। কুমারের হাতে রঙীন একটা ম্যাগাজিন, কিন্তু সে এদিকেই তাকিয়ে ছিল।

ফুল্লরার চোখে চোখ পড়তেই, চোখ নামিয়ে নিল ম্যাগাজিনের দিকে। অনু অবিশ্যি জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে ছিল, এবং বুবাইও। ফুল্লরা হাসলো, অর্থপূর্ণ। বোঝাতে চাইলো, পরে জানাবে।

কিন্তু বুবাই ওকে জিভ ভেংচে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। অনু হাসলো। ফুল্লরা অনুকে চোখের ইশারায় কুমারকে দেখালো। অনুর হাসি বিস্তৃত হলো, এবং ও বাঁ কনুই দিয়ে কুমাকে আল্‌গা খোঁচা

দিল। কুমার ভুরু কুঁচকে অনুর দিকে তাকালো। অনু চোখের ইশারায় ফুল্লরাকে দেখলো। কুমার ফুল্লরার দিকে তাকালো। ফুল্লরা হাসলো ঠোঁট বাঁকিয়ে চোখের পাতা নাচালো। ভুরু কুঁচকেই ফুল্লরাকে দেখলো, এবং হঠাৎ যেন কিছু বলবে, এইভাবে মুখ খুলতে গিয়েও একটু ঘাড় ঝাঁকালো, তারপরে পিছন ফিরে একবার দেখলো, ইচ্ছা করেই, ফুল্লরাকে দেখিয়ে। ফুল্লরার বুঝতে অসুবিধা হলো না, কুমার ওকে ছড়ার কথা মনে করিয়ে দিতে চাইছে।

কমল সিগারেট ধরালো। ফুল্লরার নাকে ভাজা তামাকের একরাশ ধোঁয়া ঢুকতেই, ও ভ্রূকুটি করে, মুখ সরিয়ে নিল জানালার দিকে, বললো 'ওম্হ। স্মোকিং প্রোহিবিটেড না?'

কমল বললো, 'প্রহিবিটেড! কিন্তু লঙ্ জার্নিতে, একটা জানালার মতোই, স্মোকিং ইজ ভেরি মাচ্ নেসেসিটি।'

কমলের কালো গোঁফের নিচে স্বাভাবিক লাল ঠোঁটের ফাঁকে সাদা ঝকঝকে দাঁতের হাসি ফুটলো।

ফুল্লরা নাক কুঁচকে হাসলো। কমল আবার বললো, 'অবিশ্যি আমার ব্র্যাণ্ডটা সস্তার, গন্ধটাও বেশ কড়া।'

'কড়া না, কটু।' ফুল্লরা বললো, এবং হাসলো, আবার বললো 'আচ্ছা জেড্ –।'

কমল তৎক্ষণাৎ দাঁতে জিভ ঠেকিয়ে একটা শব্দ করলো। একটু কাত হয়ে, মুখ নামিয়ে বললো, 'নামটামগুলো মনে মনেই রাখো না। আর যদি ডাকতেই হয়, তেরো ইজ বেস্ট।'

ফুল্লরা থতিয়ে উঠেছিল। কমলের কথা শুনে হাসলো, বললো, 'তেরো বলে ডাকবো?'

'ক্ষতি কী?' কমল বললো, 'আমার নামধাম আসল পরিচয়টা আপাতত ভুলে যাও।'

ফুল্লরা বললো, 'তা কী করে সম্ভব? তোমার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, আমি কথা বলছি কী করে?'

'ওই পর্যন্তই, পরিচয় একটা আছে।' কমল বললো, 'কিন্তু আমি কে, সেটা মনে মনেই রাখো। তুমি আমার অবস্থা নিশ্চয়ই কিছুটা অনুমান করতে পারছো ?'

ফুল্লরা বললো, 'পারছি তুমি এখন—।'

'হুম্! আমি এখন পুরী যাচ্ছি।' কমল বাধা দিয়ে বলে উঠলো, এবং হাসলো।

ফুল্লরার মনে হলো, কমলের চোখের ঠুলিতে যেন একটা ইশারা খেলে গেল। মনে হওয়া ছাড়া আর কিছু না, দেখতে পাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। ও স্বর নিচু করে বললো, 'আমি ভাবতেই পারিনি তোমাকে কলকাতায় দেখবো, তাও আবার এই বাসে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি—।'

কোনো জঙ্গলে।' কমল হেসে বললো।

ফুল্লরা বললো, 'না, হয়তো কোনো জেলে।'

'ও শব্দটা উচ্চারণ করো না।' কমল বললো, 'কথাবার্তায় ওদিকেই যেও না।' কমল গলার স্বর আরো খাদে নামালো, 'অ্যাবস্‌কণ্ড, জেল, এসব শব্দ একদম অ্যাভয়েড করবে। আমি এখন কোথায় চাকরি করছি, বিয়ে করেছি কী না, বউ দেখতে কেমন, ক'টি ছেলেমেয়ে, এসব জিজ্ঞেস করতে পারো না ?'

ফুল্লরা কথাগুলো শুনতে শুনতে এতো অবাক হয়ে যাচ্ছিল, আপনা থেকেই ওর ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল, চোখের বিস্ময়ে রীতিমতো বিভ্রান্তি। কমল বেশ শব্দ করেই হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই সামনের দিকে ফিরে তাকালো। সামনের আসনগুলোর কেউ কেউ ওর এবং ফুল্লরার দিকে ফিরে তাকালো। চোখে কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা। পিছন থেকে ছড়া শোনা গেল, 'অই আদরি ডাগ্‌রি ছেম্‌ড়ি কী মন্ত্র তোর চক্ষে···।'

'চুপ! নো আদরি অ্যাফেয়ার।' সঙ্গে সঙ্গে বাধা, এবং প্রকৃতই ছড়ার স্বর চুপ হয়ে যায়।

ফুল্লরা অবাক নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তার মানে? সত্যি নাকি ?'

'সাত্য মিথ্যে তো পরের কথা।' কমল বললো, 'তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো। পুরনো একজন কলেজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে, এরকম জিজ্ঞেস করাই তো স্বাভাবিক, তাই না? তোমাকেও আমি জিজ্ঞেস করতে পারতাম, কিন্তু তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তোমার বিয়ে হয়নি।'

ফুল্লরাব চোখে হাসি চিকচিক করে উঠলো, এবং ঠোঁটেও। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি করেছো নাকি।'

'না।'

'কারোর সঙ্গে—।'

'নতুন করে কিছু ঘটেনি।' কমল ফুল্লরার জিজ্ঞাসার মধ্যেই বলে উঠলো।

ফুল্লরা ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখের পাতা নিবিড় করে জিজ্ঞেস করলো, 'পুরনো কিছু আছে নাকি?'

কমল সিগারেটে টান দিয়ে বললো, 'হয়তো ছিল, কিংবা ছিল না। ঠিক কিছু জানি না।'

ফুল্লরার স্থির দৃষ্টি কমলের চোখের নিকষ কালো কাঁচের ওপরে। ওর ইচ্ছা হলো, কমলের চোখ দুটো দেখবে। কালো কাঁচের ওপর, কমলের চোখ দুটো ও কল্পনা করার চেষ্টা করলো। মোটা ভুরুর নিচে, কালো টানা উজ্জ্বল চোখ। কিন্তু হঠাৎ ওর কানে বেজে উঠলো, 'কেমন করে ভালোবাসতে হয়, আমি জানি না। কিন্তু ভালোবাসতে ইচ্ছা করে।' এবং কমলের কালো কাঁচের বুকে একটি ছবি ভেসে উঠলো; প্রায় একটি কিশোরের মুখ, যার ওপর-ঠোঁটের ওপর সবে মাত্র গোঁফের সবুজ রেখা দেখা দিয়েছে।

ফুল্লরা বললো, 'কিছু জানো না বলছো, মেনে নিচ্ছি। কিছু বুঝতে পেরেছো তো?'

'মানে?'

'মানে, কিছু কিছু বিষয় জানার থেকেই বুঝতে হয় বেশি।'

'তা হলে বুঝেছি '

'কী ?'

কমল তৎক্ষণাৎ জবাব না দিয়ে, দুই আঙুলে টিপ করে, জানালা দিয়ে সিগারেটের শেষাংশ ছুঁড়ে ফেললো। ফুল্লরার উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি কমলের কালো ঠুলির ওপরে। কমল বললো, 'বলতে পারছি না, কী বুঝেছি।'

ফুল্লরা তথাপি তাকিয়ে রইলো। কমল সামনের দিকে তাকালো, কিন্তু আবার মুখ ফিরিয়ে ফুল্লরার দিকে দেখলো, এবং হেসে বললো, 'আসলে আমি জানিই না।'

ফুল্লরার দৃষ্টি আস্তে আস্তে অন্যমনস্ক হয়ে উঠলো।

॥ সাত ॥

ছ মাস মানেই এক বছর, ফুল্লরা মনে মনে হিসাব কষে দেখলো। এম. এ. ফাইনাল পরীক্ষা দিতে তিন বছর লেগেছিল। ওর একলার না, ওদের বছরের সকলের। নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা না হওয়া আর বারে বারে পেছিয়ে যাওয়ার প্রথম দিকের ভিক্‌টিম্‌ ছিল ফুল্লরারা। এদিকে তিন, ওদিকে অনার্সের সঙ্গে ডিগ্রী কোর্সের তিন, ছ বছর। তার সঙ্গে আরো সতেরো মাস। বাঙলা হিসাবে সতেরো মাসকে দেড় বছর বোঝায়, কিংবা বলা যায়, দু বছর চলছে। তার মানে, সাত বছর পাঁচ মাস। ঠিক দিনের দিন হিসাব করে কি কমলের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল?

মোটেই না। কমলকে সেইভাবে মনে রাখবার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি, কারণও অতএব নেই। অবিশ্যি চোখে না পড়ার মতো ছেলে কমল ছিল না। অনেকগুলো কারণ ছিল তার পিছনে। এখন ওর এই ঝাঁকড়া চুল আর গোঁফদাড়িতে যা ঢাকা পড়ে রয়েছে, ওর এই চোখ মুখ তখন দেখাতো কাটা কাটা। অনেকেরই যেমন সব মিলিয়ে একটি মুখ, তা সুন্দর বা মন্দ যা-ই হোক, কমলের যেন ঠিক সেই রকম ছিল না। যেমন ওর মোটা ভুরু দুটো। প্রায় আট বছর আগের সেই প্রায় কিশোরের একটি মুখে, অনেকটা বেমানান লেগেছিল। কারণ সেই তুলনায়, চোখ দুটো ছিল কালো আর কিছুটা টানা। নাকটা মেয়েদের মতো টিকলো। কেবল টিকলো বললে ঠিক বলা হয় না। কেমন একটা তীক্ষ্ণতা, অথচ খুব উঁচু না। ঠোঁট দুটিও সেইরকম। যেন আঁকা রেখায় লাল। চিবুকের ঠিক মাঝখানে একটি

গভীর রেখা, যা এখন পুরোপুরি দাড়িতে ঢাকা। এখন ও মোটা না, কিন্তু দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মেদবর্জিত পেশল শরীরকে সুগঠিত আর স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে। তখন ছিল একহারা, রোগা বোগা, মাথার চুল ছোট করে ছাটা। বোঝা যেতো, সে সময়ে, কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র যখন, ও দাড়ি কামাতো, কিন্তু গোঁফ কামাতো না। গোঁফের পাতলা সবুজ রেখা দেখলেই বোঝা যেতো। কিছুদিন না কামানোর জন্যই, ওর সারা গালে আর চিবুকেও হালকা সবুজ রঙ দেখা দিত। ফরসা ও বরাবরই, টকটকে না, বাঙালী ফরসা যাকে বলে। এরকম রঙকেই বোধহয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলে। অবিশ্যি, ফুল্লবার ধারণা, আজ পর্যন্ত যতগুলো রঙ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের ওরিজিন আর মিক্সড্ কালার, সবগুলোই বোধ হয় বাঙালাদের শরীরের রঙ ফোটাবার জন্য দরকার হয়।

কমল তখন কিশোর না, তরুণও না। দুয়ের মাঝামাঝি। অথচ, ওকে যে এক কথায় মিষ্টি ছেলে মনে হতো, তা মোটেই না। ওর পোশাক আশাক ছিল সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মডার্ন। স্মার্ট অবিশ্যই। ঠিক অহংকারী নয়, একটু লোক দেখানো কায়দাকানুন ছিল। আলাপ হবার পরে, ফুল্লরা ওর মুখে যখন প্রায়ই 'পার্সোনালিটি'-এর কথা শুনতো, বুঝতে পারতো, কায়দাকানুনের ভাবভঙ্গিগুলো ছিল ওর পার্সোনালিটির অভিব্যক্তি। কমল মুখে তা বলতো না। কিন্তু পার্সোনালিটি একটা মানুষের বৈশিষ্ট্যের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কমল এ কথা বলতো। হাস্যকর। ফুল্লরার মনে হতো। ব্যক্তিত্বের জন্য কোনো ভঙ্গির দরকার হয় না। ওটা ভিতরের ব্যাপার। কমলের মন যে তখনো কাঁচা, বোঝা যেতো।

কমল একটা গাড়িতে কলেজে আসতো। কখনো কখনো নিজেই ড্রাইভ করে আসতো। ও সম্পন্ন পরিবারের ছেলে, ওর বাবা একজন ব্যারিস্টার। ওর ঠাকুর্দাও ছিলেন ব্যারিস্টার। কমল নিজেই বলতো, 'আমার ঠাকুর্দা ছিলেন ইংরেজদের খয়ের খাঁ। আর আমার বাবা এখনকার সরকারের খয়ের খাঁ। আমি পছন্দ করি না।' ওর পছন্দ

অপছন্দে, পরিবারের কিছু আসতো যেতো বলে আদৌ মনে হতো না। হয়তো বাহাদুরি নেবার জন্যই বলতো। কিন্তু বলতো খুব স্বাভাবিকভাবে। দারুণ ভাবভঙ্গি করে না।

কমলের একটা দল ছিল। ছেলে আর মেয়েদের একটা দল। তাদের কারোকে কারোকে ও গাড়িতে করে কলেজে নিয়ে আসতো। খরচ করতো প্রচুর। কেবলমাত্র কফির কাপ সামনে নিয়ে, জলের গেলাসে চুমুক দিয়ে, টেবল ঘিরে আড্ডা দিত না। রকমারি খাবারের ডিশ্-এর অর্ডার হতো। কলেজ স্ট্রীট অঞ্চল থেকে চৌরঙ্গি পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত ওদের আড্ডার জায়গা বিস্তৃত ছিল। আর সবটাই ছিল কমলকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু কমল ছাত্র হিসাবে ছিল ভালো। ওর অনার্স ছিল কেমিস্ট্রীতে। হায়ার সেকেণ্ডারিতে ওর যা রেজাল্ট ছিল, চালাকি করে সে রকম রেজাল্ট করা যায় না।

ফুল্লরার সঙ্গে পরিচয়ের আগে, কমলকে ও যা যা মনে করতো, তার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ হলো, চালাক, অহংকারী, চালবাজ, বড়লোকি দেখানো। যতো রকমের খারাপ হতে পারে। ফুল্লরার মনে করবার কতগুলো কারণ ছিলো। উত্তরবঙ্গের যে-শহর থেকে ও কলকাতার কলেজে পড়তে এসেছিল, সে-শহরে ওদের পরিবারের পরিচয়টা বিরাট। ওর বাবা ব্যারিস্টার নন বটে, ক্রিমিন্যাল ল'ইয়ার হিসাবে কয়েকটি জেলাব্যাপী নামডাক। বংশপরম্পরা পেশা ও পশার আইন ব্যবসা। ফুল্লরার বাবার সম্পর্কে লোকে বলে, ফাঁসির আসামীর গলার দড়ি খুলে, ফিরিয়ে আনতে পারেন। উত্তরবঙ্গে ওদের সম্পত্তি বা বাড়ির কথা আলাদা। কলকাতায় বিশেষ করে গাড়ির অভাবটা ফুল্লরা খুব বেশি অনুভব করতো। ওদের জেলা শহরে, ওকে কখনো গাড়ি ছাড়া বের হতে হতো না। কলকাতায় বাসে ঝুলে ওকে কলেজে আসতে হতো। বাড়ির গাড়িতে কারোকে কলেজে আসতে দেখলে, প্রথমেই ওর চোখের সামনে ভেসে উঠতো ওদের নিজেদের গাড়িগুলো। একটা তো না,

তিনটে গাড়ি। অবিশ্যিই একান্নবর্তী পরিবারের। সেটা ফুল্লরাদের পারিবারিক খ্যাতির আর একটা কারণ। একসঙ্গে এতবড় পরিবার, বিশাল বাড়ি, অতিথিশালা, মন্দির, আর পূজাপার্বণ, রীতিমতো জাঁকজমকের ব্যাপার।

ফুল্লরার চোখে, অতএব কমলের আচার আচরণ, ভালো লাগবার কারণ ছিল না। দেমাকী আর চালাক মনে করতো। কিন্তু কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করতে হলে ওকে যে কৃচ্ছ্রসাধন করতেই হবে, সেটা আগেই জানা ছিল। কলকাতায় ওদের কিছুই নেই। কালীঘাটের কোথায় একটি বাড়ি আছে, ফুল্লরা যা কখনো চোখে দেখেনি। শুনেছে পূর্বপুরুষদের তীর্থবাস বা শ্রাদ্ধাদি কাজের জন্য বা গঙ্গাস্নানের জন্য বাড়িটি কেনা হয়েছিল। এখন দূরসম্পর্কের কোনো আত্মীয় পরিবার বাস করে। বাস করতে দেবার একমাত্র চুক্তি, প্রয়োজনে কেউ কখনো এলে, তাকে থাকবার জন্য ঘর ছেড়ে দিতে হবে। ফুল্লরা জ্ঞানত কখনো ওদের বাড়ির কারোকে কালীঘাটের সেই বাড়িতে যেতে দেখেনি।

প্রশ্ন উঠেছিল ফুল্লরা কলকাতায় কোথায় থেকে পড়বে। হস্টেলে, সেটাই স্বাভাবিক। বাবা কাকা জ্যাঠা, সবাই আপত্তি করেছিলেন। আত্মীয়-বাড়ি ছিল কিছু। জ্যাঠামশাইয়ের মামার বাড়ির কথাই তার মধ্যে বিশেষ করে উঠেছিল। অনু—ফুল্লরার দিদির বাড়ির কথা ওঠেনি, তা না। কিন্তু জামাইয়ের বাড়িতে থেকে মেয়ে পড়বে সেটা কারোরই মনঃপূত ছিল না।

যে-কোনো আত্মীয় থেকে, ফুল্লরার কাছে কুমার ছিল অনেক বেশি আপন। দিদিকে নিয়ে তো কোনো কথাই নেই। কৃচ্ছ্রসাধনে ওর আপত্তি ছিল না, স্বাধীনতার দাম ছিল তার থেকে অনেক বেশি। কুমারের সঙ্গে ওর সম্পর্ক প্রীতি আর বন্ধুত্বপূর্ণ, তার সঙ্গে দিদির স্নেহ ভালোবাসা। ফুল্লরা কলকাতায় বাস করবে, অথচ এদের সান্নিধ্য পাবে না, ভাবতেই পারতো না। ওর জয় সেখানে বাড়িকে রাজী করাতে

পেরেছিল। অবিশ্যি তার আগে, দিদি আর কুমারদাকে চিঠি লিখে রাস্তা তৈরি করেই রেখেছিল।

'খুব চিন্তিত হয়ে পড়লে মনে হচ্ছে?' কমল গম্ভীর আর ভাঙা ভাঙা স্বরে বললো।

ফুল্লরা চমকিয়ে উঠে শব্দ করলো 'অ্যাঁ?' তারপরেই লজ্জা পেয়ে হাসলো, বললো 'চিন্তিত না, মনে পড়ছিল কয়েকটা কথা।'

কমল কিছু না জিজ্ঞেস করে, ফুল্লরার দিকে ফিরে রইলো। চোখে ঠুলি ঢাকা থাকলেও, ও যে ফুল্লরাকেই দেখছে, বোঝা যাচ্ছে।

ফুল্লরার মুখে রঙ বদলিয়ে গেল, লজ্জাটা বেশি অনুভব করলো। বললো, 'পুরনো দিনের কথা।'

কমলের গোঁফদাড়ির ভাঁজের উজ্জ্বলতা কিঞ্চিৎ মলিন হয়ে উঠলো। পর মুহূর্তেই আবার হেসে উঠে জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ কথা বলো তো? আমার কোনো ছেলেমানুষির কথা?'

ফুল্লরা দেখলো, কমলের মোটা ভুরু ঠুলি ছাপিয়ে কপালের দিকে বেঁকে উঠেছে। হেসে ঘাড় নেড়ে বললো, 'তোমার না আমার ছেলেমানুষির।'

ফুল্লরার কথা শুনেও কমল তখনই মুখ ফিরিয়ে নিল না। ঠোঁটের হাসির সঙ্গে ভুরু তেমনি চোখের ঠুলি ছাপিয়ে বেঁকেই আছে। ফুল্লরা যেন আবার নতুন করে লজ্জা পেয়ে গেল। মুখ ফেরাতে গিয়ে, ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকিয়ে, একটু হেসে উঠলো। কমল ওর সেই বিশিষ্ট নিচু স্বরে বললো, 'তোমার ছেলেমানুষি? আমি বোধ হয় অনুমান করতে পারছি।'

এবার ভুরু কুঁচকে উঠলো ফুল্লরার। কমলের বেঁকে ওঠা ভুরুর কোণ ঠুলির আড়ালে হারিয়ে গেল। হাসিটা ছড়িয়ে পড়লো ওর ঘন কালো গোঁফদাড়ির ভাঁজে। ফুল্লরা যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো, কালো ঠুলির ভিতরে কমলের কৌতুকের ছটায় হাসি উজ্জ্বল চোখ দুটো। ফুল্লরা লজ্জার সঙ্গে একটু অস্বস্তিও বোধ করলো। কি অনুমান করতে

পারছে কমল? ফুল্লরা যে ওকে কলেজে প্রথম দিকে চালাক আর অহংকারী ভাবতো, সেটাই অনুমান করছে নাকি? কিন্তু ফুল্লরা ওর সে-মনোভাবের কথা কোনোদিনই কমলকে বলেনি। সে-মনোভাব ওর ততো দিন ছিল, যতো দিন কমলের সঙ্গে পরিচয় হয়নি। পরিচয়ের পরে ওর মনোভাব বদলিয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করলো, 'কী অনুমান করতে পারছো, শুনি?'

কমলের দাঁতের ঝিলিক দেখা গেল। গোঁফ দাড়ি থাকা সত্ত্বেও ওর পুরোনো মুখটা মনে পড়ছে। সেই দুষ্টু দুষ্টু মতলবী হাসি। কমল বললো, 'বোধ হয় কবির কথা মনে পড়েছিল।'

'কে কবি?' ফুল্লরার ভ্রূকুটি চোখের অন্যমনস্কতায় দ্রুত স্মৃতি হাতড়ানোর আলো-ছায়ার ধন্দ। কয়েক সেকেণ্ড পরেই ওর দু চোখ ঝলকিয়ে উঠলো এবং অবাক লজ্জায় হেসে উঠে বললো, 'যাহ্! কী বলছো?'

কমল শব্দ করে হা-হা স্বরে হেসে উঠলো, আবার তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলিয়ে নিল। কিন্তু সামনের আসনগুলো থেকে কেউ কেউ ওদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলো। সেই আসনের তিন জনেই, দু দিকে দুই অল্পবয়সী পুরুষ, মাঝখানে বিরাট খোঁপার মহিলা। পিছন থেকে তখনই শোনা গেল, ছড়া কাটার সুরে, 'দিনে দিনে বাড়ে আদরি বাপ মায়ের আদরে/চান্দের জোছনা য্যান্ উছ্লায় গাঙেরে/ভরা গাঙের ঢেউ যেমন অথৈ অধরা/আ'লো ওই আদরি তুই পীন পয়োধরা।'...

'নো, নো মোর আদরি ফোকস্।' অন্য স্বর বাধা দিয়ে বলে উঠলো, 'স্টপ সুকুমার।'

সম্ভবত সুকুমারের গলাই শোনা যায়, 'হোয়াই স্টপ্'। আমি কি খারাপ কিছু বলেছি। দিস্ ইজ্ সিমপ্লি ফোক লোর অব্—।'

'নো দিস ফোক লোর।' অন্য স্বর বলে উঠলো।

সম্ভবত সুকুমারের গলাই শোনা গেল, 'তা হলে ওয়াটার বোটলটা আমাকে একবার দাও। কোলাঘাট থেকে নতুন জল ভরা হয়েছে,

খড়্গপুর পার হতে চলেছে, আমাকে আর একবারও দেওয়া হয়নি।'

অন্য স্বর, 'দেওয়া হবে। তুমি অনেক জল টেনেছ, বেশি খেলে উঠে যাবে।'

আর এক অন্য স্বরে হাসির সঙ্গে, 'হ্যাঁ, বাচ্চাদের দেখিস না, দুধ হজম না হলে মুখ দিয়ে দই ওঠে?'

'আমার উঠে ওঠে বাইনচোত্। শালা তো—।'

তো পর্যন্তই সুকুমারের মুখেই সম্ভবত শক্ত হাত চাপা পড়লো। ওদিকে চাপা পড়তেই, ফুল্লরা ঠিক ওর পিছনেই নিচু স্বর শুনতে পেলো 'কী অডাসিটি দেখেছেন? খোঁজ নিয়ে দেখুন, এরাই হয়তো পাঁচ দশটা পাশ করা শিক্ষিত যুবক।'

অন্য নিচু স্বর, 'এদের পাশ করাকে আপনি শিক্ষা বলেন? এরা শিক্ষিত? কলেজের সব টুকে মেরেছে। আমি এদের শিক্ষিত বলি না, এরা হচ্ছে বলির পাঁঠা।'

'কিন্তু কলিকালে তো মশাই বলি উঠে যায়নি।' প্রথম নিচু স্বর, 'এদের আপনি বলি দিতে পারবেন না, তা হলে মানুষ খুনের দায়ে পড়বেন।'

অন্য নিচু স্বর, 'এসব সহ্য করার থেকে খুনের দায়ে পড়ে ফাঁসি যাওয়াও ভালো, তবু এসব আর সহ্য করা যায় না।'

প্রথম নিচু স্বর, 'না মশাই, আমি আবার এতোটা বলতে চাই না। এদের এই সব বাঁদরামির থেকে, এদেশে আরো অনেক অসহ্য ব্যাপার ঘটছে। বলি দিয়ে ফাঁসিই যদি যেতে হয়, তা হলে আগে আরো অনেককে বলি দিতে হয়। আরে মশাই, আপনি আমার ওপর রেগে গেলেন নাকি? কী মুশকিল শুনুন—।'

॥ আট ॥

আব কিছুই শোনা গেল না। ফুল্লবাব ভীষণ কৌতূহল হলো, পিছন ফিরে তাকিয়ে, এই মুহূর্তে এবাব দুই ভদ্রলোককে দেখে নেয়। কিন্তু লজ্জা কবলো। তা ছাড়া পিছনে 'আদাব ফোকলোর'-এর গ্রুপটাও আছে। ওদের কথায় স্পষ্টই বোঝা গিয়েছে, ওয়াটার বোটলে কোলাঘাট থেকে নতুন কবে মদ ঢ না হয়েছে। ফুল্লরা একবার কুমারের দিকে তাকালো। কুমাব মুখ নিচু কবে বই পড়ছে। ফুল্লরার সম্পর্কে সে রীতিমতো উদাসীন। এই হচ্ছে ছেলেদে চরিত্র। ওদের যেন বয়স হয় না। যে-মুহূর্তে দেখলো, বিষযটি নিজেব অগম্য, অস্পষ্ট, আব তাব সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি ছেলে, অমান চেহারা বদলিয়ে যাবে। অথচ বলবার সময়ে বলবে, মেয়েবা ঈর্ষাকাতর। কুমারদার উদাসীনতা, আর গভীর মনোযোগ দিয়ে ম্যাগাজিন পড়া দেখে, ফুল্লরা মনে মনে আর এক চোট হেসে নিল। ও দেখলো একবার দিদির দিকে। অনুও ওর দিকেই একবার তাকালো, তারপবে কমলের দিকে। বুবাই এখন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখছে। কুমারদার ভাবনা থেকেই, ফুল্লরার মনে হলো, একই মনোভাব থেকে কমল কবির কথা হয়তো বলছে।

'আমার হাসিটা বরাবরই বিচ্ছিরি।' কমল বললো, 'কিছু মনে করো না।'

ফুল্লরা বললো, 'তোমার হাসিটা আমার কখনো বিচ্ছিরি মনে হয়নি। লোকে ফিরে তাকিয়ে দেখলে আর কী করার আছে? কিন্তু আমার ছেলেমানুষি ভাবনা যে কবিকে মনে করে, তা অনুমান করলে কেমন করে?'

কমল ফুল্লরার দিকে তাকালো। কমলের মুখের হাসিটা এখন কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত। ওর ঠুলির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। বললো, 'তোমার কথাবার্তা শুনে মনে হতো, ব্যাপারটা তোমার কাছে ছেলেমানুষি মনে হয়েছিল।'

ফুল্লরা ঠোঁট টিপে হাসলো, বললো, 'তখন যা মনে করেছিলে, তা হয়তো না-ও হতে পারে।'

কমল তাড়াতাড়ি বললো, 'ওহ্, নিশ্চয়! না-ও হতে পারে। তা হলেও আমার অনুমানই যে সত্যি নয়, তা বলতে পারো না। হয়তো তুমি বিমানের কথাই ভাবছিলে।

ফুল্লরার মনে মনে খুব হাসি পেলো। কিন্তু ও হাসলো না। কিছুক্ষণ আগে বিমানের কথা ওর মনে পড়েছিল, বাসে উঠে, প্রথম দিকে। তখন সত্যি সত্যি পুরনো দিনের কথা মনে পড়েছিল, কলেজ আর ইউনিভারসিটির দিনগুলোর কথা!

ফুল্লরাকে চুপ করে থাকতে দেখে কমল ওর দিকে তাকিয়েছিল। ফুল্লরা একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। ও কমলের দিকে ফিরে তাকালো। কমলও তখনই মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালো। কিন্তু ফুল্লরার মনে হলো, ঠুলির আড়ালে কমল চোখের কোণ দিয়ে যেন ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। যদিও কমলকে এরকম ভাবতে অসুবিধা হয়। চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে দেখবার ছেলে ও কখনোই ছিল না। তবু কেন হলো? কমল মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য? কমল কী একটু গম্ভীর হয়ে গেল?

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি মন খারাপ করলে নাকি?'

কমল ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। আবার ওর বাঁকা ভুরু খোঁচার মতো জেগে উঠলো ঠুলির বাইরে। অবাক স্বরে বললো, 'মন খারাপ?' তারপরেই একটু যেন বিষণ্ণ হেসে বললো, 'তা বলতে পারো। আমার চোখের সামনে সেই দিনগুলো ভেসে উঠছে, যে দিনগুলো আর কখনই ফিরে আসবে না। তাই না? আমরা যাই

করি না কেন, যে-পথেই চলি, পুরনো দিনগুলোকে ভোলা যায় না বিশেষ করে সেই সব দিনগুলো, দায়দায়িত্বহীন, খেলে, গল্প করে আড্ডা দিয়ে বেড়ানো। অনেকটা আলবেয়ার কামুর সেই কথার মতো, স্রোতস্বিনী জলের ধারায় স্নান এবং স্বেদসিক্ত রমণীর সান্নিধ্য।' কমল একটু হাসলো, বললো, 'সে হিসাবে বলতে পারো, মনটা কেমন কেমন করছে।'

কমল এমনভাবে বললো, ফুল্লরার হাসি পেয়ে গেল। বললো, 'বেশ বললে, মনটা কেমন কেমন করছে। কিন্তু সত্যি বলছি, বিমানের কথা আমার মনে পড়ছিল না। আগে অনেক ছেলেমানুষিই তো করেছি। সে সব কথাও মনে পড়ছিল।'

কমলের ভুরু তেমনি ঠুলির ওপরে জেগে আছে। ওর চোখে কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা। বললো, 'তবু, বিমানের কথা ভোলবার না।'

'ভুলিনি তো।' ফুল্লরা বললো, 'ভুলবো কেন? কবির সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। কিন্তু ও যে আদৌ কবি ছিল না, সেটাই আমার দুঃখ। কারণ ও আসলে—আসলে—।' কথা শেষ না করে ফুল্লরা হেসে উঠলো।

কমল তেমনি ঠুলির বাইরে ভুরু জাগিয়ে তাকিয়ে রইলো।

'ওসব তো কামুর বয়স হয়ে যাওয়ার দুঃখের কথা।' ফুল্লরা হেসে বললো, 'তুমি নিশ্চয়ই সেই সাইলেণ্ট মানুষ নয়?'

ঠুলির আড়ালে, কমলের চোখ দেখা যায় না। কিন্তু ঘন কালো গোঁফ দাড়ির মধ্যে ওর হাসিটা যেন কিঞ্চিৎ বিষণ্ন দেখাচ্ছে। বললো, 'দ্য সাইলেণ্ট ম্যান! না, সে হিসাবে বয়স বেড়ে যাবার দুঃখে আমি কিছু বলছি না। কিন্তু পুরনো দিনগুলো কি ভোলা যায়? আমি তো পারি না। সে সব দিন যে আর ফিরে আসবে না, কোনো সন্দেহ নেই, তাই না? মনটা একটু খারাপ হয় বই কি। তোমার হয় না? কিন্তু ভালোও লাগে।'

ফুল্লরার ভুরু দুটো কুঁচকে উঠলো, এক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক

দেখালো ওকে। একটু বা অবাকও। কমলের কাছ থেকে যেন এরকম কথা আশা করেনি। পুবনো দিনেব জন্য মন খারাপ, আর যারই হোক, কমলেব কেন হবে? কমলেব বর্তমান ব্যাকগ্রাউণ্ড তো সম্পূর্ণ আলাদা। ওর সব কিছুই হলো পজেটিভ্। অন্তত হওয়া উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলতে বা জিজ্ঞেস করতে, ফুল্লরার সংকোচ হলো। ওব ভাবনাটা যথার্থ নাও হতে পারে। তা ছাড়া, এখনকার এই কমল ওর কাছে কিছুটা রহস্যময়, অচেনা, আবছা, এবং একটা অস্পষ্ট ভয়ও আছে। ও হেসে বললো, 'আমাব এমনিতে খারাপ লাগে না—পুরনো দিনেব কথা মনে হলে, তবে ভালো লাগে, তুমি যা বললে। কিন্তু তুমি কি কামুব লেখা এখনো পড়ো নাকি?' ফুল্লরার চোখে কৌতুকের ছটা।

কমল মাথা নাড়িয়ে, সামনেব দিকে তাকিয়ে বললো, 'না, যা পড়বার তা আগেই পড়েছি।'

'কিন্তু স্রোতস্বিনী জলেব ধারায় স্নান আর স্বেদসিক্ত রমণীদের কথা বোধহয় লেখা ছিল না।' ফুল্লরা হাসতে গিয়ে, ঠোঁটের ওপর আল্‌তো করে বাঁ হাত তুলে চাপা দিল, এবং ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখের তারায় ঝিলিক হেনে আবার বললো, 'স্নান আর স্বেদসিক্ত রমণী সান্নিধ্য। দারুণ! কামুব নামে, কথাগুলো তোমার নিজের মনে হচ্ছে।'

কমল চুল দাড়িতে ঝাপ্‌টা দিয়ে, বাঁ দিকে ফিরে তাকালো। ঠুলিব বাইবে ওর মোটা ভুরু আবার খোঁচা হয়ে উঠলো। ওর সেই বিশিষ্ট স্বরে অবাক হযে বললো, 'তাই নাকি? আশ্চর্যই তো! তা হলে কথাগুলো আমার মনে কোথা থেকে এলো?

'বোধ হয় বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে?' ফুল্লরার চোখে মুখে রুদ্ধ হাসির দ্যুতি।

কমলেব কালো গোঁফ দাড়িও যেন লাল হয়ে উঠলো, বললো, 'অ্যাবসার্ড।' বলেই অন্যমনস্ক আর চিন্তিত হয়ে উঠলো। মুখ তুলে সামনের দিকে তাকালো, আবার বাঁ দিকে ফিরে বললো, বোধহয় অন্য

কোনোকিছুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি, কারোর কবিতা-টবিতার সঙ্গে।'

ফুল্লরার মনে পড়লো পুরনো দিনেরই কথা, কমলের সেই কয়েক বছর আগের মুখ। কোনো কারণে বিব্রত বা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেই, ওর মুখ লাল হয়ে উঠতো। আর তা কাটাবার জন্য ওর লজ্জিত চেষ্টা সহজেই ধরা পড়ে যেত। এখন যেমন পড়ে যাচ্ছে। কমলের অনেক দিনের অদর্শন, আবছা অচেনা ছায়াটা যেন, অনেকখানি কেটে গেল। সেই চেনা কমলকে দেখা যাচ্ছে। যে-কারণে ফুল্লরার ইচ্ছা হলো, কমলকে আরো একটু চেপে ধরতে। ও বললো, 'গুলিয়ে যাবার কী আছে। অ্যাবসার্ডই বা কেন বলছো? নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই স্রোতের জলে স্নান আর স্বেদসিক্ত রমণীদের কথা মনে এলে, ক্ষতি কী?'

কমল কয়েক মুহূর্ত ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে রইলো। আস্তে আস্তে ওর চোখের ঠুলির কাচে যেন কৌতুকের ঝিলিক লাগলো, আর মুখে ছড়িয়ে পড়লো হাসি। বললো, 'না, কোনো ক্ষতি নেই।'

বলে সামনের দিকে তাকালো। ফুল্লরার চোখের অনুসন্ধিৎসা তীব্র হলো। কমলের এই ছোট জবাবে, কিছুই বোঝা গেল না। ও কী বলতে চাইলো? ফুল্লরা কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই, কমল আস্তে আস্তে আবার ওর দিকে ফিরে তাকালো। মুখের হাসিটা আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, বললো, 'অভিজ্ঞতা একেবারে নেই, তা বলা যায় না। বারাসতের সেই পুকুরের জলে স্নান করতে গিয়ে অরুণা একবার ডুবতে বসেছিল। পুকুরের জল স্রোতস্বিনী নয় বটে, তবে সকালের রোদে বেশ চিকচিক করছিল। আর তুমি তখন সাঁতার কেটে অনেক দূরের জলে চলে গেছলে।'

কমলের কথা শেষ হবার আগেই, ফুল্লরার ভ্রূকুটি চোখে হাসি চলকিয়ে উঠলো, এবং শেষ পর্যন্ত খিলখিল করে হেসে উঠলো। বলে উঠলো, 'ওহ্ কম—।'

'হরিপদ।' কমল বেশ শব্দ করে বলে উঠলো। যেন ফুল্লরার স্বর ডুবে যায়।

ফুল্লরা তৎক্ষণাৎ মুখে হাত চাপা দিয়ে, উদ্বিগ্ন চোখে সামনে ডাইনে তাকালো, বললো, 'সরি, একটুও মনে ছিল না হরি—ইয়ে তেরো তেরো।'

বলেই আবার ওর হাসি পেয়ে গেল, আবার মুখে হাত চাপা দিল। আর নিজের অপ্রতিরোধ্য উদ্দাম হাসি গোপন করার জন্য বাঁ দিকে জানালার ওপর ঝুঁকে পড়লো। ইতিমধ্যেই যাত্রীরা কেউ কেউ ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কমলের মুখে হাসি। সে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। ফুল্লরার চোখে মুখে বাতাসের ঝাপটায় চুল ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ভাবলো, এই হচ্ছে আসল কমল। শান্ত মুখে মিটিমিটি হেসে একটা সীরিয়স ব্যাপারকে এক মুহূর্তে হাস্যকর করে তোলা।

নয় ॥

ফুল্লরার চোখের সামনে সাঁতারের সেই ছবি ভেসে উঠলো। কমলের উৎসাহেই প্ল্যান করে বারাসতে সাঁতার কাটতে যাওয়া হয়েছিল। বারাসতে হিমাদ্রিদের একটা বাগানবাড়ি ছিল। অনেক ফলের গাছ আর কিছু চাষআবাদ। একটা ছোট পুকুর আর একটা বড়। বড় পুকুরটাকে একটা দীঘিই বলা যায়।

হিমাদ্রি কমলদের কনটেমপোরারি, ফুল্লরার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। কমল তার আগে, হিমাদ্রিদের বারাসতের বাগানে কয়েকবার গিয়েছিল। একবার দল বেঁধে। ভোরবেলা কলকাতা থেকে বারাসতে গিয়ে পুকুরে সাঁতার কাটার প্ল্যানটা কমলেরই ছিল। কমল সাঁতার শিখেছিল সুইমিং ক্লাবে। ছেলেবেলায় এক সময়ে নাকি ওর সাঁতারু হবার ঝোঁক হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে, ফুল্লরা অনেকবারই ঠোঁট উল্‌টিয়ে বলেছে, 'লেকের জলে আর হেদোর পুকুরে সাঁতার শেখা আবার সাঁতার শেখা নাকি ? সাঁতার কেটে গঙ্গা পেরোতে পারো ?'

কমল বলতো, 'অনায়াসে, তবে একটু সাহায্য দরকার হতে পারে —মানে সঙ্গে একজন থাকলে সুবিধে হয়।' ফুল্লরা হাসতো। অবিশ্যি এক কথায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে, কলকাতার গঙ্গা ওর পক্ষে পার হওয়াও হয়তো সম্ভব ছিল না। কিন্তু ওর সাঁতার শেখা নদীতেই। স্রোতস্বিনী নদী যাকে বলে, উত্তরবঙ্গের প্রবল ধারায় যে নদী প্রবাহিত। বর্ষাকালে সমুদ্রের মতো বিশাল সায়রেও সাঁতার কাটার অভিজ্ঞতা ওর ছিল। অতএব ওর কাছে কলকাতার লেক পুকুর আর সুইমিং পুল, সবই একটা অকিঞ্চিৎকর মনে হতো। ওখানে সাঁতার কেটে যে সাঁতার

শেখা যায়, আদৌ ওর বিশ্বাস হতো না। সাঁতার শেখার একটা বিলাস মনে হতো।

হিমাদ্রিদের বারাসতের বাগানে যাবার উৎসাহটা কমলের সেইজন্যই বিশেষ ভাবে ছিল। 'তোমার সাঁতার একদিন দেখতে হবে।' কমল প্রায়ই বলতো।

'কিন্তু তোমাদের ওইসব সুইমিং পুলে আমি সাঁতার কাটবো না,' ফুল্লরা বলতো।

'কেটো না, তোমাকে নিয়ে যাবো মস্তবড় একটা নির্জন পুকুরে, পাড়াগাঁয়ে।' কমলের এই কথার জবাবে ফুল্লরা বলেছিল, 'তাহলে রাজী।' হিমাদ্রিও তৈরি ছিল। অরুণা—অরুণা ঘোষ তখন কমলকে ভীষণ ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল। আর অরুণাকে হিমাদ্রি। অরুণার ছিল ইতিহাসে অনার্স। অরুণার প্রসঙ্গ হিমাদ্রিই তুলেছিল। অরুণা প্রায়ই সাঁতারের কথা বলতো। সময়টা তখন বসন্তের শুরু, সকালের দিকে একটু শীত শীত ভাব। অরুণা সুইমিং কস্ট্যুম নিয়ে গিয়েছিল। ফুল্লরার ছিল না। ও কোমরে শাড়ি জড়িয়েই জলে ঝাঁপ দিয়েছিল। ওরকম ভাবে সাঁতার কাটাতেই ও অভ্যস্ত ছিল। মাথার চুলে অবিশ্যি শক্ত করে পাতলা গামছা বেঁধে নিতে হয়েছিল। ওর মাথার চুল তখন বেশ বড় ছিল। নিরিবিলি বাগানে, রোদ ঝলকানো দীঘির মতো পুকুরটা দেখে, ফুল্লরা খুশি হয়েছিল। কিন্তু অরুণা সব আনন্দ মাটি করে দিয়েছিল।

কমল ফুল্লরাকে অনুসরণ করেছিল। কিন্তু হিমাদ্রি কমলের থেকে ভালো সাঁতার জানতো। ও ফুল্লরাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেনি, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিল। ফুল্লরা হিমাদ্রির কাছে হেরে গিয়েছিল। ফুল্লরা যেটা ওর নিজের সম্পর্কে খেয়াল করেনি, তা ওর শরীরের ওজন, ওজন আর অনভ্যাসে ফুরিয়ে যাওয়া দম। দেশ থেকে কলকাতায় এসে, প্রথমদিকে কিছুটা রোগা হলেও, পরে ওজন কিছু বাড়তে আরম্ভ করেছিল। সেটাকে মোটা বলা চলে না। সম্ভবত তারুণ্যের ধারের

সঙ্গে কিছু কিঞ্চিৎ ভারও বাড়ে। সাঁতার কাটা অভ্যাস ছিল না অনেক দিন। আর সাঁতার কাটা এমন একটা খেলা, চর্চা না থাকলেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়।

পিছন থেকে একটা আর্তনাদের পরেই, কমলের চিৎকার প্রথম শোনা গিয়েছিল, 'অরুণা! অরুণা ডুবে যাচ্ছে।' ফুল্লরা আর হিমাদ্রি দু'জনেই ঘাটের দিকে ফিরেছিল। অরুণা ঘাট থেকে বেশিদূর আসেনি, সম্ভবত ওর পায়ের তলার সিঁড়ি হারিয়ে গিয়েছিল। সাঁতার জানলে সেখানে ডুবে যাবার কোনো কারণ ছিল না। ফুল্লরা আর হিমাদ্রি তৎক্ষণাৎ ঘাটের দিকে সাঁতার দিয়েছিল। কিন্তু দু'জনেই তখন কিছুটা ক্লান্ত। সেই তুলনায় কমল বেশিদূর আসেনি, সেও ঘাটের দিকেই ফিরতে আরম্ভ করেছিল। অরুণা তখন রীতিমতো হাবুডুবু খাচ্ছিল। ফুল্লরার মনে আছে, বিদ্যুচ্চকিতে ওর মস্তিষ্কে একটা আতঙ্কিত চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল, কমল যদি অরুণার কাছে যায়। আর অরুণা কোনো রকমে ওকে জড়িয়ে ধরতে পারে, তা হলে একটা বিশ্রী সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। তারাশঙ্করের তারিণী মাঝি গল্পটা তখন ওর মনে পড়েছিল। একমাত্র রক্ষে, কমলের সাঁতারে তেমন গতি ছিল না, ও পা দাপাচ্ছিল অনেক বেশি। সেই তুলনায় হিমাদ্রি ছিল অনেক বেশি দ্রুতগামী। কিন্তু সেই বিপদের মুহূর্তে, ফুল্লরা কোথা থেকে শক্তি পেয়েছিল, কে জানে? ও হিমাদ্রিকে অতিক্রম করে, তীরের বেগে অরুণার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। অরুণার টুপি জড়ানো মাথাটা তখন একটু একটু দেখা যাচ্ছিল, আর ক্লান্ত ছুঁড়ে দেওয়া হাত। কমল অরুণাকে ধরবার আগেই, ফুল্লরা রুদ্ধস্বরে বলে উঠেছিল, 'ছেড়ে দাও, তুমি সিঁড়িতে ওঠো।' বলেই অরুণার একটি হাত পিছন থেকে টেনে ধরে, আপ্রাণ শক্তিতে ঘাটের দিকে টেনে নিয়েছিল। ফুল্লরা জানতো, সামনে থেকে ধরলে, অরুণা ওকে জড়িয়ে ধরবে। ইতিমধ্যে হিমাদ্রি এসে পড়েছিল। ফুল্লরা বলেছিল, 'আমি ওকে ঠিক ধরেছি, তুমি আমার হাত ধরে, ঘাটের সিঁড়িতে টেনে নাও।'

ব্যাপারটা একদিক থেকে ঘটেছিল হরিষে বিষাদ। অরুণাকে জল থেকে তুলে আনার পরে, হিমাদ্রি ডাক্তার ডেকে এনেছিল। পেটে কিছু জল যাওয়া ছাড়া লাংসে কিছু হয়নি। অচৈতন্য হয়েছিল খুব সামান্য সময়ের জন্য। অরুণা যে একেবারেই সাঁতার জানতো না, তা না। কিন্তু দীঘির কালো জল, পিছল সিঁড়ি ওর মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, আর জলের নিচে সিঁড়িতে পা পিছলে মাটির নাগাল না পেয়ে, ভয় পেয়েই ও ডুবতে বসেছিল। প্রোগ্রাম অনুযায়ী বারাসতের বাগান-বাড়িতে দুপুরে খেয়ে ওরা ফিরেছিল। হিমাদ্রি প্রায় সব সময়েই অরুণার কাছে বসেছিল। হরিষে বিষাদটা পরে বিষাদে হরিষ হয়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকেই, অরুণা হিমাদ্রির টানটা সঠিক অনুভব করেছিল।

ফুল্লরার স্মৃতি থেকে হাসিটা আবার উদ্দাম হয়ে উঠতে চাইলো। ও জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে কমলের দিকে তাকালো। কমলের মুখ সামনের দিকে ছিল। ফুল্লরা মুখ ফেরাতেই সে ফিরে তাকালো। ফুল্লরা বললো, 'অদ্ভুত তুমি। কোন্ কথা থেকে কোথায় চলে গেলে?'

'কী করবো বলো।' কমল নিচু স্বরে বললো, 'রমণীর স্নান বলতে সেই দৃশ্যই আমার অভিজ্ঞতা। অবিশ্যি তার পরের ব্যাপারটা—।' কমল থেমে গেল।

ফুল্লরা ভুরু কোঁচকালো। কমল একটু হেসে বললো, 'কিন্তু স্বেদসিক্ত রমণীর অভিজ্ঞতা—বিশ্বাস করো, বই ছাড়া আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।'

'মিথ্যে কথা।' ফুল্লরা ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে বলে উঠলো, 'কমল, সত্যি নয়।'

কমলের কালো ঠুলির উপরে আবার ভুরু খোঁচা দিয়ে উঠলো। পরমুহূর্তেই হেসে উঠলো। বাঁ দিকে ঈষৎ ঝুঁকে খুবই নিচু স্বরে বললো, 'তাহলে রূপাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা আমি বলতে পারি।'

কমল কথাটা উচ্চারণ মাত্র, ফুল্লরার মুখে লাল ঝলক লেগে গেল। মুখ তুলে কিছু বলতে গিয়েও ওর গলায় কোনো কথা ফুটলো না। কমলের ঝকঝকে কালো ঠুলির দিক থেকে ওর মুখ ফিরিয়ে নিল।

॥ দশ ॥

একটা চিৎকার শোনা গেল, 'বাহারাগোরা।' মাঝখানে পিচ বাঁধানো অনেকখানি খোলা জায়গা প্রায় গোলাকার। তাকে ঘিরে বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছে। বাসটা ঝাঁকুনি দিয়ে, বাঁ দিকে মোড় নিয়ে, গর্জন থামালো।

'পুরীর রাস্তা।' পিছন থেকে কেউ বললো, ফুল্লরা শুনতে পেলো।

ইতিমধ্যে খড়্গপুর চকে বাস একবার দাঁড়িয়েছিল। ফুল্লরা কমলের সঙ্গে কথার ব্যস্ততার মধ্যে লক্ষ্য করেছিল। ও নামেনি, কমলও না। দিদি বুবাই নামে নি। কুমারদা নেমেছিল, খেয়াল ছিল, কখন উঠেছিল, দেখেনি। কমল হঠাৎ রূপাদের বাড়ির প্রসঙ্গ তুলতেই ওর মনটা চলে গিয়েছিল, একদিন এক আলো-ঝলমলে হুল্লোড়ের রাত্রে। আলো-ঝলমলে ঠিক বলা যায় না, বরং স্বপ্নালোকে। আলো-ছায়ার এক শৈল্পিক পরিবেশ। রূপার—রূপা রায়েব জন্মদিনের উৎসব ছিল। রূপা ছিল ফুল্লরার সম-শ্রেণীর। এবং ইংরেজিতে ওরও অনার্স ছিল। গাড়িটা ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়াতেই, ফুল্লরার চোখ পড়লো বাহারাগোরার প্রান্তরে, ঘন থেকে আবছা হয়ে গেল রূপাদের বাড়ির সেই রাত। বাঁ চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া চুলের গোছা সরিয়ে, ও ডান দিকে তাকালো।

অনু বুবাইয়ের হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে। কুমারও উঠে দাঁড়ালো। অনুর সঙ্গে ফুল্লরার দৃষ্টি বিনিময় হলো। অনুর চোখে অনুসন্ধিৎসা, সে কমলের দিকে চোখ ফেরালো। . তার চোখের জিজ্ঞাসাটি স্পষ্ট পড়া যায়। স্বাভাবিক, কমলের পরিচয় জানার ঔৎসুক্য বা কৌতূহল দিদির

মনে জাগতেই পারে। প্রথামতে, দিদি আর কুমারদার সঙ্গে কমলের পরিচয় করিয়ে দেওয়াও উচিত। কিন্তু উপায় আছে কী? ও জিজ্ঞেস করলো, 'দিদি, তুমি নামছো?'

অনু বললো, 'হ্যাঁ, বুবাইয়ের বাথরুম পেয়েছে।'

ফুল্লরা বুবাইয়ের দিকে দেখলো। বুবাই রুষ্ট মুখে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা তুলে, ফুল্লরাকে কয়েকবার দেখিয়ে দিল, তারপরে মায়ের হাত ছাড়িয়ে, ওর বাবার পাশ দিয়ে জোর করে পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ফুল্লরার মস্তিষ্কে তখনো রূপাদের বাড়ির ঝাপসা ছবি, যেখান থেকে ও পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারে নি। বুবাইয়ের রুষ্ট মুখে কড়ে আঙুল দেখানোর আকস্মিকতায় ও চমকিয়ে উঠলো, এবং হেসে উঠে, পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'কেনরে বুবাই, আড়ি দিচ্ছিস কেন?'

বুবাই তখন অদৃশ্য, ফুল্লরার চোখ পড়লো সেই তিন জনের ওপর, যাদের মধ্যে একজন আদরিব ফোক্ সঙের গায়ক। তিন জনেরই চোখ লাল, তিন জনেই পিছনের দরজার দিকে যেতে গিয়ে, ফুল্লরার কথা শুনে, পেছন ফিরে তাকালো। একজন বললো, 'তাড়াতাড়ি আয়, এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না।'

ফুল্লরা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে, ওর পিছনের জোড়া আসনের জোড়া মুখ দু'টির সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। দু'জনের বয়স ষাটের কাছাকাছি, দু'জনেই ফুল্লরার দিকে তাকিয়েছিলেন। উভয়ের চোখমুখের ভাবই বুবাইয়ের মতো রুষ্ট, এবং এটা খুবই স্বাভাবিক, তথাপি ওর মনে চকিতের জন্যই জিজ্ঞাসা জেগে উঠলো, কেন? তখন পিছনের দরজার কাছ থেকে স্বর ভেসে এলো, 'জোছনা করেছে আড়ি।'

অনুর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। কুমারকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে ফুল্লরাকে বললো, 'নামবি নাকি? আয় না।' বলেই পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ফুল্লরা নামার কথা ভাবেনি, ও জিজ্ঞাসু চোখে কমলের দিকে তাকালো। কমল ইতিমধ্যে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। সে ঝুঁকে পড়ে নিচু স্বরে বললো, 'আমি এখানে আর নামবো না, বরং গাড়ির ভেতরটা একবার স্ক্রুটিনি করে দেখে নিই।'

ফুল্লরা ঠিক এই কারণে কমলের দিকে তাকায়নি। ও যে-কারণে জিজ্ঞাসু, সেটা একান্তই ওর মনের জিজ্ঞাসা। দিদির ডাক এতোই সহজ আর সরল, তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। নিচে নামলেই দিদি কমলের পরিচয় জানতে চাইবে। অবিশ্যি তার জবাবটা কমলের কাছ থেকে জানবার কোনো দরকার নেই। ফুল্লরা নিজের মনেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কমল তৎক্ষণাৎ উঠে, সরে গিয়ে ওকে বেরোবার রাস্তা দিল। ফুল্লরা দেখলো, কুমার তখন দাঁড়িয়ে। ও সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কুমার গেল পিছনের দরজার দিকে।

বাস থেকে নামতেই ফুল্লরার মনে হলো, রোদ যেন অঙ্গারের মতো জ্বলজ্বল করছে। রূপাদের বাড়ির সেই রাত।...মস্তিষ্কের দূর সীমায়, অস্পষ্ট সাঙ্কেতিক শব্দের মতো, কথাটা এখনো বাজছে। বাতাসটা কী সাংঘাতিক গরম! আগুনের হল্‌কার মতো। একেই বোধহয় লু বলে। এ জায়গাটা ঠিক কোনো শহর বা জনপদ নয়। একদিকের রাস্তায় অনেকগুলো ভারী আর ভরতি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। পাশে রাস্তার ধারে একটা বড় ঝোপড়ি, সেখান থেকে উনোনের ধোঁয়া উঠছে। পুরীর বাসটা যেখানে দাঁড়ালো, তার ধারে কয়েকটা ছোট চা জলখাবারের দোকান, এখানেও সেই গরম সিঙাড়ার চিৎকার, গরম চায়ের ডাক। সবই গরম, আকাশটাও জ্বলছে।

অনু ফুল্লরার কাছে এগিয়ে এসেই, প্রথমে জিজ্ঞেস করলো, 'ফুলি, ওই লোকটা তোর চেনা নাকি? কী করে আলাপ হলো?'

ফুল্লরা হেসে উঠলো। ওর পিছনের ছায়াটা যে কুমারদার, তা টের পেলো। বললো, 'লোকটা কী বলছো দিদি? কলেজে আর

ইউনিভারসিটিতে ও আমার থেকে এক বছরের সীনিয়র ছিল। আমরা একসঙ্গে পড়েছি।'

'ওমা, তাই নাকি?' অনু সরল বিস্ময়ে হেসে বললো, ফুল্লরার পিছন দিকে কুমারের দিকে তাকালো। ফুল্লরা এবার পিছন ফিরে কুমারের দিকে দেখলো। কুমারের মুখ গম্ভীর, সে সিগারেট টানছে। বললো, 'তা হলে গোঁফ-দাড়িওয়ালাকে দেখে, প্রথম থেকেই ওরকম চমকাবার ভণিতা করছিলে কেন? যেন চেনো না, খুবই ভয় পেয়ে গ্যাছো। আমাকে বললেই পারতে, তা হলে আর আমি তোমার বন্ধুকে তেরো নম্বরটা তোমাকে ছেড়ে দেবার কথা বলতাম না।'

ফুল্লরা ভুরু কুঁচকে, চোখ থেকে সান-গ্লাস খুলে, অবাক হয়ে বললো, 'এ কি বলছেন কুমারদা? আমি ওকে চিনতে পারলে আপনাকে বলতাম না?'

অনুও অবাক হয়ে গিয়ে হেসে বললো, 'তোব কুমারদার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।'

কুমার রীতিমতো অবুঝ ক্ষুব্ধ বালকের মতো মুখ করে বললো, 'হ্যাঁ, আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে আর তোমাদের দুই বোনের মাথা খুব ভালো আছে।' বলে সরে যাবার উদ্যোগ করে, এক পা গিয়ে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, যাকে তুমি চিনতে পারোনি, তার সঙ্গেই হঠাৎ ভাবে জমে গেলে!'

'ওহ্ কুমারদা, সত্যি বলছি ওর দাড়ি-গোঁফের জন্য আমি ওকে একদম চিনতে পারিনি।' ফুল্লরা প্রায় অসহায় বিস্ময়ে বললো, 'আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?'

কুমারের চোখে দ্বিধা আর বিস্ময় ফুটে উঠলো, ঈষৎ বিব্রত হয়ে বললো, 'অবিশ্বাস কেন করবো!'

'কিন্তু তুমি তাই তো করছো।' অনু বললো, 'ফুলিকে তুমি ওরকম বলছো কেন? কথাটা শুনতে দাও না। আমিও তো এতক্ষণ ধরে ভীষণ অবাক হচ্ছিলাম, আর মনে মনে ভাবছিলাম, তোমার কথাই

সত্যি হয়ে গেল নাকি ? ফুলির সঙ্গে পাশাপাশি বসে লোকটার ভাব হয়ে গেল ?' অনু হাসলো।

ফুল্লরা বললো, 'ও নিজে থেকে না বললে, আমি ওকে কিছুতেই চিনতে পারতাম না। দু'বছরের ওপর ওকে আমি চোখেই দেখিনি, তার ওপরে ওইরকম চুল দাড়ি-গোঁফের বোঝা। ওর বাড়ির লোকেরা দেখলেও বোধ হয় ওকে চিনতে পারবে না।'

কুমারের মুখে একটু বিব্রত হাসি ফুটলো, বললো, 'তবে আমাকেও খুব দোষ দিতে পারো না। কিছুই জানি না, হঠাৎ দেখলাম, তোমরা দু'জনে আচমকা বন্ধুর মতো কথা বলতে আরম্ভ করে দিলে, আর খুব হাসাহাসি শুরু করে দিলে। আর তোমরা বেশ চাপা গলায় কথা বলছিলে, একটা কথাও প্রায় শোনা যাচ্ছিল না।'

ফুল্লরা হেসে বললো, 'কেন, খুব তো আমার পেছনে লাগছিলেন। আমার সঙ্গে যদি কোনো ছেলের ভাবই হয়, তাতে আপনার কী ?'

কুমারের হাসিটা বিস্তৃত হলো, কিন্তু বিব্রতও। অনু চোখ ঘুরিয়ে বললো, 'বাহ্, শালী বলে কথা! তায় আবার অভিভাবক। গায়ে লাগবে না ? ছেলেরা সবাই এক ?'

ফুল্লরা জোরে হেসে উঠে, মুখে হাত চাপা দিল। চোখে চাপালো সান-গ্লাস। বুবাই ওর হাফ-প্যান্টের নিচটা টেনে নামাতে নামতে এগিয়ে এসে বললো, 'ফুলিমাসী, হাসো আর যাই করো, তোমার সঙ্গে আমার আড়ি।'

'কেন রে বুবাই ?' ফুল্লরা হাত বাড়িয়ে বুবাইয়ের চিবুক ধরতে গেল।

বুবাই মুখ সরিয়ে বললো 'তুমি আর এখন আমাদের কেউ নও, তুমি ওই দাড়িওয়ালা লোকটার!'

ফুল্লরার সঙ্গে অনুও শব্দ করে হেসে উঠলো। অনু বললো, 'দেখলি তো, ছেলেরা সবাই এক ?'

'সত্যি।' ফুল্লরা হাসি সামলাবার চেষ্টা করলো।

বুবাই জুতো ঘষটে দু'পা সরে গিয়ে, তর্জনী নেড়ে নেড়ে বললো, 'তা হোকগে ফুলিমাসী, আমি খুব রেগে গেছি। আমি বাবা, আমরা তোমার সঙ্গে মিশবো না, ওই দাড়িওয়ালাটা— ।'

'আহ্ বুবাই, আস্তে।' কুমার বলে উঠলো, এবং একবার বাসের দিকে ফিরে দেখে নিয়ে আবার বললো, 'বাজে কথা বলো না। কিন্তু ফুলি—।' সে ফুল্লরার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি তোমার বন্ধুর নাম ধাম কিছুই তো বললে না?'

অনু বললো, 'তুই ওর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলি না তো ফুলি? ও কি তোর সঙ্গে কখনো আমাদের বাড়ি গেছে?'

ফুল্লরার মুখে বিব্রত আর অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠলো, 'না, ও কখনো আমাদের বাড়ি যায়নি।' বলে এক মূহূর্ত চুপ করে রইলো, চোখের কোণে একবার বাসেব দিকে তাকালো, তারপরে বললো, 'দিদি, পুরী গিয়ে, আমি তোমাদের বলবো, এখন ওর নাম-পরিচয়টা বলা যাবে না—মানে ইয়ে, একটু অন্য ব্যাপার আছে। আমি তোমাদের সব বলবো, পরে। পুরী গিয়ে।'

অনু আর কুমার নিজেদের মধ্যে অবাক দৃষ্টিবিনিময় করলো, চোখ ফিরিয়ে তাকাল ফুল্লরার দিকে। ফুল্লরার অস্বস্তি বেড়ে উঠলো, বললো, 'ও নিজেই ওর নাম ধরে ডাকতে আমাকেও বারণ করেছে। ওর নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো অসুবিধা আছে। তোমাদের বলতে আমার কোনো অসুবিধে নেই, আমি নিজেও ওর সব কথা জানি না, এত দিন ও কোথায় ছিল, কী করছিল। ওর কথা থেকে বুঝলাম, ও জানাতেও চায় না।'

কুমার অপলক সন্দিগ্ধ চোখে ফুল্লরার দিকে তাকিয়েছিল। তার দিকে ফুল্লরার চোখে চোখ পড়তেই, ও কেমন অস্বস্তি বোধ করলো, আর অপ্রস্তুতভাবে হাসলো। কুমার বললো 'আমি বোধহয় বুঝতে পেরেছি।'

ফুল্লরা আর অনুর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠলো। কুমার ঠোঁট

টিপে হেসে বললো, 'বোধহয় ঠিকই বুঝেছি, কিন্তু সে কথা আমি এখন বলতে চাই না।' সে আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো।

অনুর চোখে কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা তেমনই জেগে রইলো। ফুল্লরা খানিকটা নিস্পৃহভাবে বললো, 'মোটের ওপর আমি বলতে পারি, আমরা একসঙ্গে পড়েছি, ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল—মানে, বন্ধুত্ব। আমি নিশ্চয় কখনো কখনো বাড়িতে ওর নাম করেছি, কিন্তু তোমরা ওকে কখনো দেখনি বলে চিনতে পারবে না।'

'তা না পারলেও ক্ষতি নেই।' কুমার বললো, 'তুমি ওর পাশে বসে গল্প করছো করো, কিন্তু তোমাকে বা তোমার সঙ্গে আমাদেরও, কোনো বিপদে পড়তে হবে না তো? সেরকম কোনো ভয় নেই তো?'

ফুল্লরা চোখ থেকে গ্লাস নামলো, ওর চোখে চকিতের জন্য একটা উদ্বেগের ছায়া নামলো, ও খানিকটা যেন আপন মনেই অস্ফুট উচ্চারণ করলো, 'বিপদ···ভয়···!'··

অনুর জিজ্ঞাসু চোখেও এবার একটা অবুঝ উদ্বেগের ছায়া ফুটলো। সে একবার কুমারের দিকে তাকিয়ে ফুল্লরাকে জিজ্ঞেস করলো, 'বিপদ? কিসের বিপদ, কিসের ভয়?'

'কিছু না, কিছু না।' ফুল্লরা যেন ভয় পেয়েই, প্রায় চুপিচুপি স্বরে বলে উঠলো, এবং আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো, কিন্তু ওর নিজের ভরসা বা বিশ্বাস যে তেমন নেই, সেটা ও নিজেই বুঝতে পারলো। এই প্রথম ওর মনে হলো, কমলের সঙ্গে একটু পরিষ্কার কথা বলে নেওয়া উচিত। যদিও অপরিষ্কার তেমন কিছু নেই। ও কমলের কথা কিছু কিছু অন্য বন্ধুদের মুখে শুনেছে, আর কমল নিজেও তার আত্মপরিচয় গোপন রাখার কথা বলেছে। নিজের নামটা সে উচ্চারণ করতে দিতে চায়নি। তা না দিক, কিন্তু কুমারদার কথাটা ফেলে দেবার মতো না। কমলের সঙ্গে মেশা বা যোগাযোগ থাকার মধ্যে, বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। তথাপি, এ তো ভাবাই যায় না, যেহেতু কমলের সঙ্গে পরিচয় থাকা বা কথা বলার বিপদ আছে, সেই হেতু, এখন থেকে তার

সঙ্গে আর কথা বলা চলবে না। অসম্ভব! বিশ্রী! এখন আর তা ভাবাই যায় না। ফুল্লরা তা ভাবতেই পারে না, এমন কি, সত্যি ওর নিজের যদি কোনো বিপদও হয়। কমল তো শত হলেও সেই কমল, যার দ্বারা কখনো কোনো অন্যায় করাই অসম্ভব। কমল তো আসলে সেই কমল, বুদ্ধিদীপ্ত, হাসিখুশি, উদার আর ঠাট্টাপরায়ণ, নিখাদ প্রাণের ছেলে। কিন্তু ফুল্লরার মনে হঠাৎ আর একটা খটকা লাগলো। কুমারদা একথা বললো কেন? সে কী বুঝতে পেরেছে, আর সেই-জন্যই বিপদ আর ভয়ের কথাটা তুললো?

ফুল্লরা কুমারের দিকে ফিরে কিছু জিজ্ঞেস করতে উদ্যত হতেই, বাসের আকাশ মাঠ আর কান ফাটানো তীক্ষ্ণ হর্ন বেজে উঠলো। যারা বাইরে ছিল, তারা হুড়োহুড়ি দৌড়াদৌড়ি করে বাসের দিকে ছুটে গেল। কুমার অবাক হয়ে বললো, 'আরে বুবাইটা কোথায় গেল?'

তিন জনেই ব্যাকুল হয়ে আশেপাশে তাকালো। ফুল্লরার প্রথমে চোখ পড়লো, একটা গাছতলার ছায়ায়, ওয়াটার-বটল হাতে, সেই তিন জনের সঙ্গে বুবাই কথা বলছে। কুমারের মুখ শক্ত হয়ে উঠলো, চিৎকার করে ডাকলো, 'বুবাই, ওখানে কী করছো? শীগ্‌গির এসো।' বলে নিজেই সেদিকে এগিয়ে গেল।

বাসের এঞ্জিন গর্জে উঠলো। বুবাই বাবার দিকে ছুটে এলো। অনু ডাকলো, 'চল্‌ ফুলি, উঠি।'

ফুল্লরার চোখেমুখে অন্যমনস্কতা। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, বললো, 'চলো।' ও বাসের দিকে এগিয়ে গেল, আর তখনই ওর চোখে পড়লো, একটা জীপ গাড়ি বাসের দিকে, পিছন থেকে এগিয়ে আসছে। ও একবার কুমারের দিকে তাকালো। কুমারও তাকালো ওর দিকে। কুমারের চোখে উদ্বেগের ছায়া। ফুল্লরা আবার জীপ গাড়িটার দিকে দেখলো। দেখা গেল না, বাসের পিছনে সেটা আড়ালে পড়ে গিয়েছে।

॥ এগারো ॥

বাসের পিছনে জীপটার কথা কি কমলকে জানানো দরকার? খুব স্পষ্টভাবে না হলেও, পুলিশের জীপ বলেই মনে হলো। ফুল্লরার যদি ভুল হয়েও থাকে, কুমারদার নিশ্চয়ই হয়নি। জীপটার দিকে চোখ পড়তে, কুমারদার চোখের দৃষ্টিও কেমন হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ যেন একটা অলৌকিক ঘটনার মতো জীপটাব আবির্ভাব। যখন কুমারদা ভয় আর বিপদের কথা বলেছিল, ঠিক তখনই জীপটাকে দেখা গেল। কমলকে নিয়ে, কী অনুমানে কুমাবদা বিপদের কথা বলেছিল? কথা শুনে মনে হলো, তার অনুমানটা যেন নির্ঘাৎ।

কমল উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। ফুল্লরা বললো, 'এবার তোমাকেই জানালার ধারটা ছেড়ে দিচ্ছি, আমি বরং এই সীটে বসি।'

কমলের কালো ঠুলিতে অবাক ঝিলিক, ঝিলিক সাদা দাঁতের হাসিতে, জিজ্ঞেস করলো, 'হঠাৎ?'

ফুল্লরার হাসিটা তেমন স্ফুরিত না, একটু আড়ষ্টই। কমলের দিকে ঠেলে সরে এলো, আর কমলকে তেরো নম্বর সীটের কাছে সরে যেতেই হলো। ও কমলের জায়গায় বসে বললো, 'বসো না, আমি তো অনেকক্ষণ জানালার ধারে বসেছি।'

কমলের হাতে 'মেটামরফোসিস···।' জানালার ধারে বসে, ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে বললো, 'বসে তো ছিলেই। হঠাৎ সাবালিকা হয়ে উঠলে কেন, আর উদার?'

ফুল্লরার চিন্তাগ্রস্ত অন্যমনস্কতার মধ্যেও, ভুরু কুঁচকে উঠলো, বললো 'সাবালিকা?

'তাই তো মনে হচ্ছে।' কমল বললো, 'ছোট্ট মেয়েটি জানালার ধারে বসবার জন্য তো পাগল হয়েছিল, তাই।' সে কথা শেষ করলো না।

ফুল্লরা হেসে উঠলো। কিন্তু হাসিটা উচ্ছ্বসিত না। বললো, 'ওহ্! তখন তো তোমাকে চিনতাম না। এখন তোমাকে একটু ভাগ দিতে না পারলে খারাপ লাগবে।'

কমল হেসে উঠলো, স্বর নামিয়ে বললো, 'বন্ধুর জন্য।'

'একটা কথা।' ফুল্লরা ওর রঙীন স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর থেকে, কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকালো। ওর স্বর নিচু আর উদ্বিগ্ন, 'একটা জীপ বাসের পেছনে পেছনে আসছে। মনে হলো পুলিশের জীপ।'

কমলের চোখের কালো ঠুলি থেকে শুরু করে, কুচকুচে কালো গোঁফ দাড়ি আর ঘাড় বেয়ে পড়া চুলে, চকিতেই যেন একটা পরিবর্তন দেখা দিল। ঠিক চমক লাগা যাকে বলে, তা না। একটা উজ্জ্বল ফটোগ্রাফ যেন মুহূর্তেই নেগেটিভে পরিণত হলো। কমল প্রথমে সামনের দিকে তাকালো, তারপর ধীরে ধীরে ডাইনে বাঁয়ে। বাঁ কোমরের কাছে বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরলো। নিচু স্বরে বললো, 'শুনতে পাচ্ছি।' এবং মুহূর্তের জন্য পরিবর্তনটা ওর সারা অবয়বের মধ্যেই ফুটে ওঠে, আবার আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ওকে দেখালো যেন আগের থেকেও ঝকঝকে।

ফুল্লরা কমলের এই পরিবর্তনটা স্পষ্ট বুঝতে পারলো না, কেবল মনে হলো, কমলের ভিতরে বাইরে যেন একটা কী ঘটে গেল। ও অবাক নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কী শুনতে পাচ্ছো?'

'পেছনে একটা জীপের শব্দ।' কমল তেমনই নিচু স্বরে বললো। বাঁ কোমরের কাছে ওর চওড়া হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠলো।

ফুল্লরা উৎকর্ণ হলো, পিছনে জীপের শব্দ শোনার চেষ্টা করলো, কিন্তু বাসের এঞ্জিনের আর চলমান বডির ঝম্‌ঝমে শব্দ ছাড়া কিছুই

শুনতে পেলো না। ও ওর স্বচ্ছ কাঁচের ভেতর দিয়ে অবাক চোখে কমলের দিকে তাকালো। কমলের দৃষ্টি এখন সামনে, ডাইনে বাসের ড্রাইভারের দিকে। ফুল্লরাও সেদিকে তাকালো, আবার কমলের দিকে। কমলের মুখ ড্রাইভারের দিকে। ফুল্লরা কিছু বুঝতে পারছে না। কমল কি ড্রাইভারকে কিছু সন্দেহ করেছে? কমল ওর মাথা উঁচু করে ঘাড় তুলে, আর একটু ডান দিকে ঝুঁকলো। ও কি পিছনফেরা ড্রাইভারের মুখ দেখবার চেষ্টা করছে? সে তো অসম্ভব! ফুল্লরা কুমারের দিকে দেখলো। সে কোলের ওপর ম্যাগাজিন খুলে রেখে, ওর দিকেই তাকিয়েছিল। তার চোখে মুখে অস্বস্তি। ফুল্লরার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, সে কমলের দিকে দেখলো। অন্নুর আর বুবাইয়ের দৃষ্টি এদিকে নেই, দু'জনেই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে।

'দেখা যাচ্ছে না।' কমল বললো।

ফুল্লরার বিস্ময় বাড়ছে। জিজ্ঞেস করলো, 'কী দেখা যাচ্ছে না?'

কমল বললো, 'জীপটা। কিন্তু শব্দ শুনতে পাচ্ছি, পেছনে পেছনে আসছে।'

ফুল্লরা অবাক চোখে পিছন ফিরে তাকালো। দূরের রাস্তার ধু ধু রেখা ধুলোয় হারিয়ে যাচ্ছে।

কমল বললো, 'এখান থেকে পেছনে তাকিয়ে দেখা যাবে না। সামনের রিয়ার ভিউ-ফাইণ্ডারে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

রিয়ার ভিউ-ফাইণ্ডারের কথা ফুল্লরার মনেই আসেনি। কমলের কথা শুনে ও ড্রাইভারের ডান দিকে জানালার বাইরে তাকালো। ফাইণ্ডারের কাঁচটা ও দেখতে পেলো না। ড্রাইভারের আড়াল পড়েছে, তা ছাড়া ওর উচ্চতার অসুবিধাও আছে। ডানদিকে বুবাইয়ের জায়গায় বসলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতো। জীপটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কমল তার শব্দ শুনতে পাচ্ছে, পিছনে পিছনেই আসছে। ফুল্লরা বারে বারে কমলের মুখের দিকে দেখতে লাগলো। কমল মাথা উঁচু

করে, আগের মতোই সামনের ডানদিকে দেখছে। রিয়ার ভিউ-ফাউণ্ডার। কিন্তু কমলের চোখমুখের চেহারা কেমন দাঁড়িয়েছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ফুল্লরা বুঝতে চাইছে। জানতে চাইছে, কমলের উদ্বেগ কতোখানি। ও ভয় পেয়েছে কী না। চোখের পাশ অবধি ঢাকা ঠুলিটা খুললেই, ওর চোখ দেখলেই মুখের অবস্থা বোঝা যেতো। কিন্তু কমল কি ভয় পাবার ছেলে? দু'এক বছরের মধ্যেই ওর সম্পর্কে এমন সব কথা শোনা গিয়েছে, দুর্ধর্ষ আর দুঃসাহসিক বলতে যা বোঝায় ভয়ের কথা ভাবাই যায় না।

ফুল্লরার নিজের ভয় বাড়ছে। এ ভয়টা ঠিক নিজের জন্য না। কমলকে কেন্দ্র করে, সম্ভাব্য বিপদের চেহারাটা কী দাঁড়াতে পারে, সেই আশঙ্কায় ওর ভয় বাড়ছে। তা ছাড়া কমলকে এরকম উদ্‌গ্রীব আর উৎকর্ণ হয়ে থাকতে দেখলে, নিশ্চিন্ত হওয়া দূরের কথা, সমস্ত ঘটনার গুরুত্ব বেড়ে যায় অনেক বেশি। অথচ বাস-ভরতি লোকগুলো আপন মনে আগের মতোই গল্প করছে, হাসাহাসি করছে। এমন কি পিছনের তিনজনের মধ্যে, সম্ভবত সেই সুকুমারই একবার বলে উঠেছে, 'মালা বদলের বদলে জায়গা বদল!' তারপরেই আবার আদরিব গান ধরতে যাচ্ছিল, বাধা পেয়ে থেমে গিয়েছে।

ফুল্লরা নিচু স্বরে বললো, 'তুমি কী ভাবছো? কোনো বিপদ-আপদ ঘটতে পারে?'

'কিছুই অসম্ভব নয়।' কমল মুখ নামিয়ে বললো, 'বরং খুবই সম্ভব।'

ফুল্লরার বুকের মধ্যে নতুন করে ভয়ের চমক লাগল, জিজ্ঞেস করলো, 'কী হতে পারে? ওরা পরের স্টপেজে বাসের মধ্যে এসে উঠবে?'

'তা কেন?' কমল বললো, 'ওরা মাঝপথেই বাসটা দাঁড় করাতে পারে।'

ফুল্লরার মুখ দিয়ে কথা সরলো না। কমল আবার বললো, 'সে

সম্ভাবনাটাই বেশি। অবিশ্যি যদি ওদের কাছে খবর থাকে। ওরা এখনো পেছনে পেছনে আসছে, আমি ঠিক শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

আশ্চয! ফুল্লরার এই উদ্বেগ, ব্যাকুলতার মধ্যে মনে হলো, জীপের শব্দটা ও কিছুতেই আলাদা করে শুনতে পাচ্ছে না। ও বললো, 'কুমারদাই প্রথম বিপদ-আপদেব কথা বলছিল।'

'কে কুমারদা?' কমল যেন আকস্মিক উত্তেজনায়, সন্দিগ্ধ আর উৎসুক হয়ে উঠলো।

ফুল্লবা বললো, 'আমাব দিদিব বর, এই যে আমাদের ডান পাশে—।'

'উনি কেন বিপদ-আপদের কথা বলেছেন?' কমল ফুল্লবার কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলো, 'বিপদ আপদেব কথা উনি কি করে জানলেন? কী করেন উনি? আমি তোমাকে এসব কিছুই জিজ্ঞেস করিনি।'

ফুল্লরা অবাক চোখে কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকালো। কালো ঠুলিটার দিকে দেখেই বুঝতে পারলো, কমলের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। কমল একবার মুখ ফিরিয়ে চকিতে কুমারের দিকে দেখেও নিল। কিন্তু কুমারদার সম্পর্কে এত কথা জিজ্ঞাসার কারণ কী? কুমারদা কী করে, কমলের সেটাও জানা দরকার?' আর সেটা জিজ্ঞেস করেনি বলে, ওর স্বরে উত্তেজিত হতাশা, অথচ কেমন কঠিন। কমল কেমন বদলিয়ে যাচ্ছে, এইটুকু সময়ের মধ্যেই। ভয় আর উদ্বেগেব মধ্যে ফুল্লরার মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠলো। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হচ্ছে, অথচ ও কোনো দোষ করেনি। বললো, 'কুমাবদা একটা বেসরকারী ফার্মে কাজ করে। কেন? তুমি জিজ্ঞেস করলে আমি নিশ্চয়ই বলতাম।'

'আমাকে ভুল বুঝো না।' কমল নিচু দ্রুত স্বরে বললো, 'উনি কেন বিপদ-আপদেব কথা বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না।'

ফুল্লরা বললো, 'আগের স্টপেজে যখন নেমেছিলাম, তখন তোমার কথা ওরা জিজ্ঞেস করেছিল। আমি তোমার কোনো পরিচয় দিইনি, বলেছি আমার পুরনো বন্ধু।'

'ওঁরা নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছেন, বন্ধুর নামধাম না বলায়?' কমল জিজ্ঞেস করলো।

ফুল্লরা বিব্রত হয়ে বললো, 'তা হয়েছে।'

'আর তুমি নিশ্চয়ই বলেছ, বন্ধুর নাম ধাম বলার অসুবিধা আছে, তাই না?' কমল তৎক্ষণাৎ আবার জিজ্ঞেস করলো।

ফুল্লরা অবাক চোখে কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকালো। কমল হঠাৎ একটু হেসে উঠলো, 'বুঝেছি।'

কমলকে হাসতে দেখে, ফুল্লরার অপরাধ বোধটা বেড়ে গেল। বললো, 'আমি অন্যায় করেছি, না?'

'না, ভুল।' কমল বললো, 'মানে একটু বোকামি, কিছু মনে করো না। একটা যে-কোনো নাম, একটা যে-কোনো পরিচয় দিয়ে দিলেই হতো। কিছুই না বলার থেকে, কিছু বলা ভালো, তাই না? তোমার কুমারদা খুব সচেতন মানুষ। প্রায় ঠিক ব্যাপারটাই আঁচ করেছেন। কিন্তু—।' কমল হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো, ঘাড় উঁচু করে, সামনে ডান দিকে তাকালো, প্রায় ফিসফিস স্বরে বললো, 'জীপ হর্ন দিচ্ছে।'

ওর কথার সঙ্গে সঙ্গেই, বাসের ভিতরে দুবার বেল বেজে উঠলো! মৃদু ব্রেক কষার একটা ঝাঁকুনি লাগলো, এবং বাস রাস্তার বাঁ দিকে একটু সরে গেল। জীপের তীক্ষ্ণ হর্ন ঘন ঘন বাজছে, পিছন থেকে ক্রমেই সামনে এগিয়ে আসছে, ফুল্লরা শুনতে পাচ্ছে। ও দেখলো, কমল সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। এখন ওর ডান হাত বাঁ কোমরের কাছে, বাঁ হাত দিয়ে সামনের সীটের রড মুঠি করে ধরা।

বাস আর একটু বাঁয়ে চাপলো, গতি আরো কিঞ্চিৎ মন্থর হলো। জীপের হর্ন এখন একেবারে বাসের গায়ে গায়ে, জীপটাকে দেখা যাচ্ছে।

॥ বার ॥

অদৃশ্য অথচ গর্জিত জীপটা, বাসের পাশ দিয়ে ছুটে হঠাৎ রাস্তার ওপর ভেসে উঠলো। তীরবেগে ছুটে চলেছে। জীপের পিছনে নিশানের মতো উড়ছে একটা নীল রঙের রেশমী শাড়ির আঁচল। ভেসে এলো ছেলেমেয়েদের সমবেত গানের কলি, 'আজ জ্যোছ্‌না রাতে সবাই গেছে বনে।'…তার মধ্যেই একটি ছেলের চিৎকার শোনা গেল, 'টা টা, গুডবাই!'…বাসটা রাস্তার মাঝখানে সরে এসে গতি বাড়ালো। দ্রুতগতি জীপটার পিছনে, ভিতর দিকে ঠাসাঠাসি একটা ভিড়। বাসের ভিতরে কয়েকবার ক্লিয়ারেন্স ঘণ্টা বেজে উঠলো।

ফুল্লরার চিবুকে ঠোঁটের ওপরে, নাকের ডগায়, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এখনো নিশ্বাস পড়তে চাইছে না, বুকটা ফুলে উঠেছে। ডান হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে আছে ডান দিকের হাতল। চোয়াল দুটো এখনো শক্ত। দূরে দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া জীপ থেকে চোখ ফিরিয়ে, কমলের দিকে তাকালো।

কমলের কপালে আর চোখের কোলে, কালো ঠুলির নিচেই, ঘামের চিকচিকে বিন্দু। নাকটা টকটকে লাল। কালো ঠুলি দুটো গভীর অন্ধকার। বাতাসের ঝাপটায় বাঁ দিকের চুল দাড়ি কাঁপছে, তথাপি ঘাম শুকায়নি। ও আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে ফুল্লরার দিকে তাকালো, আর আস্তে আস্তে ঠুলির অন্ধকারে আলোর রেখা জাগলো।

ফুল্লরা কমলের মনের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছে না। কালো ঠুলির ভিতর থেকে ও এখন ফুল্লরাকেই দেখছে, এটা স্পষ্ট। ওর দাড়ি ভরা গালটা এখন অনেক চওড়া দেখাচ্ছে। বাঁ কোমরের কাছ থেকে হাতটা

তুলে, জানালার ধারে রাখলো, এবং আস্তে আস্তে একটু পিছনে হেলে, বাঁ দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

ফুল্লরা তাকালো কুমারের দিকে। কুমারের চোখ কমলের দিকে ছিল, এখন ফুল্লরার দিকে তাকালো। কুমারের গোটা মুখ ঘামে ভেজা। হঠাৎ-ই যেন তার মুখে অনেকগুলো রেখা জেগে উঠেছে, আর খুব অবসন্ন দেখাচ্ছে। এখনো তার চোখে উদ্বেগের ছায়া। অবাক দৃষ্টি ফুল্লরার চোখের ওপরে রাখা, এবং হুস্ করে একটা নিশ্বাস ফেললো। আর চকিতে একবার কমলের দিকে দেখে, খুব আস্তে মাথা ঝাঁকালো। অনু বুবাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে। বুবাই চলে যাওয়া জীপ আর তার আরোহীদের সম্পর্কেই মাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করছে। ওরা কারা, কেন গান করছিল, কেন টা-টা গুডবাই করলো, এবং ওরাও পুরী যাবে কী না। অনু সাধ্যমতো জবাব দেবার চেষ্টা করছে।

কুমার হিপ্ পকেট থেকে দোমড়ানো রুমাল বের করে মুখ ঘাড় গলা মুছতে আরম্ভ করলো। ফুল্লরাও যেন হঠাৎ অনুভব করলো, ও ঘেমেছে। কোমরে গুঁজে রাখা রুমালটা টেনে নিয়ে চিবুকের কাছে চেপে ধরেই, ও কমলের দিকে তাকালো। কমলও তো ঘেমেছে, ও ঘাম মুছবে না? নিজের ঘাম মুছতে গিয়ে এ কথাটাই ওর প্রথম মনে এলো। কিন্তু ও তা জিজ্ঞেস করলো না, এবং ওর মনে একটা ইচ্ছা জাগলো, আর ইচ্ছাটাকে একটা উদ্গত নিশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করলো। কমলের ঠুলিতে এখন অন্ধকার। ওর চুল উড়ছে। মাথাটা এখন অনেকখানি বাঁ দিকে হেলানো।

ফুল্লরা চিবুক আর গলার কাছে চেপে চেপে ঘাম মুছলো। কিন্তু ঘাম এখন অনেকখানি শুকিয়ে গিয়েছে। ওর নিজেকে খুব ক্লান্ত আর দুর্বল লাগলো। ও সামনের দিকে এগিয়ে, দু পা ছড়িয়ে দিয়ে, যতোটা সম্ভব সমস্ত শরীরটাকে পিছনে এলিয়ে দিল, কিন্তু বুকজোড়া, নিজের চোখেই বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠলো, তাই ডান দিক থেকে আঁচল টেনে

বুক ঢেকে বাঁ দিকের জামায় গুঁজে দিল। চোখ বুজলো, আর বাসের ভিতরে যাত্রীদের ছোটখাটো কথা কানে ভেসে আসতে লাগলো, যা কিছুটা অর্থহীন শব্দের মতো। কমল যেন তখন কী বলছিল? স্বেদসিক্ত রমণী···রূপাদের বাড়ি।···ওহ্, জীপটা যদি সত্যি পুলিশের হতো, আর যা সন্দেহ করা গিয়েছিল, তাই যদি ঘটতো? এখন সমস্ত ব্যাপারটা তিন জনের মধ্যে আছে। কমল, ওর আর কুমারের মধ্যে। একটা ভয়ের সম্ভাবনা এখন সব সময়ের জন্যই জেগে রইলো। নিজেদের মধ্যে স্পষ্ট কোনো কথাবার্তা না বলেও, একটা সম্ভাবনা এখন স্পষ্টতর হয়ে উঠলে, যে-কোনো মুহূর্তে, যে-কোনো যায়গায়, পথের মাঝখানে বা কোনো স্টপেজে, এবং সমুদ্রের ধারে পৌঁছুনো পর্যন্ত। এ রকম একটা যাত্রায়, কমলের সঙ্গে কেন দেখা হলো? কমল চেনা না দিলেই বা ক্ষতি কী ছিল? ফুল্লরা কখনোই চিনতে পারতো না, কারণ অচেনা চুল-দাড়িওয়ালা তেরো নম্বরের দিকে ভালো করে ও কখনো তাকিয়ে দেখতো না, এবং একবারও চেনা চেনা মনে হয়নি, যে কারণে ভালো করে খুঁটিয়ে দেখবার দরকার ছিল না। তেরো নম্বর, তেরো নম্বরই থেকে যেতো, আর তার মেটামরফোসিস···।

ফুল্লরার মন এখন একটা অদ্ভুত আলাদা পথে ভেসে চললো। অভিমানে ভরে উঠছে ওর মন, এটা আশ্চর্য! ওর বাঁ কনুই কমলের কোমরের কাছে ছুঁয়ে আছে। একটা দুঃখ আর ক্ষোভ ওর মনে জেগে উঠছে। অথচ একটা লজ্জা। মনের মধ্যে কত রকমের অনুভূতি একসঙ্গেই জোট পাকিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ধারার মতো, সবগুলো মিলেমিশে একটা প্রবাহেই ছুটে চলে। হ্যাঁ, ও তো কমলকে ভুলেই গিয়েছিল। ঠিক মনে রাখা বলতে যা বোঝায়, সেরকম করে কখনোই আর মনে রাখেনি। মনে করে রাখাটা কি কারোর ইচ্ছা মতো ঘটে? ইচ্ছা করলেই মনে রাখা যায় না। কিংবা ইচ্ছাটাই হয়তো তখন তার আদল বদলিয়ে নেয়, আর মন থেকে অনেক কিছু সরে যায়। হারিয়ে যায়। কমল ওর কাছে আস্তে আস্তে অবাস্তব

হয়ে উঠেছিল। অবিশ্যি সান্নিধ্যের মধ্যে না। অদর্শনে, জীবনের ভিন্নতায় কমল অবাস্তব হয়ে উঠেছিল, মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। আট মাসের কমল। হিসাবটা তো সেই রকমই।

কমল কেন হঠাৎ ওরকম করে রূপাদের বাড়ির কথা বললো? স্বেদসিক্ত রমণী···রূপাদের বাড়ি। এটা কি ব্যঙ্গ না বিদ্রূপ? 'তা হলে রূপাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা আমি বলতে পারি।' কেমন একটা চ্যালেঞ্জের মতো শোনাচ্ছিল না ওর স্বর? তার আগে অবিশ্যি ফুল্লরাও জোর দিয়ে বলেছিল, কমল মিথ্যা কথা বলছে। বলেনি কী?

হ্যাঁ, ফুল্লরা স্বেদসিক্ত ছিল। রূপার জন্মদিনের সেই রাতের সময়টা তো গ্রীষ্মকালই ছিল। রূপার বাবা মা অভিভাবকদের কাছ থেকে ওরা কিছুটা সময় নিজেদের জন্য আলাদা করে নিয়েছিল। সেই কিছুটা সময় ওদের কেটেছিল দোতলায় আর ছাদে। আলিপুরের সরকারি বাড়িটা ছিল বিরাট। অভিভাবক আর বয়স্ক অতিথি অভ্যাগতরা সবাই একতলায় ছিলেন। ফুল্লরা জানতো না, কিন্তু নিশ্চয় রূপা বন্ধুদের সঙ্গে আগেভাগে পরামর্শ করে, কয়েক বোতল বীয়ারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। অথবা কমল, বা হিমাদ্রি বা শ্যামল, ওরা কেউ লুকিয়ে এনেছিল। বিমানের পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না। টাকা তো ওর কাছে কখনোই থাকতো না, ওর সেরকম সাহসও ছিল না।

একটা ছেলেমানুষি ফূর্তি। নিজেদের দুঃসাহসী বেপরোয়া ভাববার খানিকটা আনন্দ। অনেকগুলো আলোই নেভানো ছিল। চুরি করে বেপরোয়া হওয়া ছাড়া তো কিছু না? রূপাদের বাড়িতে জানাজানি হলেও হয়তো ব্যাপারটাকে তেমন একটা অপরাধজনক ব্যভিচার বা ওদের ডিজেনারেটেড বলা হতো না। গেলাস আনা হয়নি। কে কে যেন দাঁত দিয়েই বীয়ারের বোতলের ছিপি খুলেছিল। ফেনিলোচ্ছ্বাসের একটা ঢেউ। কাড়াকাড়ি করে খাওয়া, অথবা কারোকে জোর করে খাওয়ানো। আর ছেলেমেয়ে, সকলের হাতে ঠোঁটেই একটা করে জ্বলন্ত সিগারেট।

কে ফুল্লরার মুখে প্রথম বোতল থেকে ঢেলে দিয়েছিল? ওর বুকের শাড়িতে কিছুটা চলকিয়ে পড়েছিল। বিশ্রী তেতো। হিমাদ্রি? শ্যামল? কমল? বিমান সব সময়ে ওর পেছনে লেপ্টে দাঁড়িয়েছিল। বিমান আর ওকে নিয়ে, তখন সবাই মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। বিমান যদি সত্যি—সত্যিকারেব একজন কবি হতো, তা হলে বন্ধুদের সিদ্ধান্তে কোনো ভুল হতো না। ফুল্লরাব মনের কথাটা কেউ জানতো না। ঠিক, ও খুব বেশি বিমানের সঙ্গে মিশেছিল। বিমান কবিতা লিখতো। একজন কবি ওর কাছে পরম বিস্ময়, নিবিড় মুগ্ধতা যা আদৌ বিমান ছিল না। ফুল্লরা আশা কবতো। বিমান আসলে মনেব দিক থেকে কাব ছিল না। এমনকি ওর হাতেব স্পর্শে ঠোঁটের স্পর্শেও ও কোথাও কবি ছিল না। ওর কোনো ক্ষুধাই ছিল না, অথচ ও ছিল অভুক্ত আর অসুস্থ। এ কথা ফুল্লরা কারোকে বলতে পারেনি, বলতে চায়নি, মনে মনে জেগে উঠেছিল অস্বীকার। এখন বিমান কী করে? একজন প্রগতিশীল ফিল্ম্ ডাইরেক্টরের এ্যাসিসটাণ্ট আর চিত্রনাট্যও নাকি লেখে। আর এখনো কালেভদ্রে ভুল বানানের কবিতা বেরোয় নামকরা একটা সাপ্তাহিকে।

ফুল্লরার হাতেও জ্বলন্ত সিগারেট ছিল, আর, ও ফু ক ফুঁক করে টেনেছিল। কে ওর মুখে তারপরে বীয়ারের বোতল চেপে ধরেছিল? কমল? ও কয়েক ঢোক গিলে ফেলেছিল। তেতো, বিশ্রী, ওর উদ্‌গার উঠেছিল, আর পেটের মধ্যে কলকলিয়ে উঠেছিল, আর গলগল করে ঘেমেছিল। হাসাহাসি, ছুটোছুটি, কাড়াকাড়ি, জোর করে গলায় ঢেলে দেওয়া, এবং কাদের সঙ্গে কখন ফুল্লরা ছাদে গিয়েছিল? এবং কখন এক সময় ও হঠাৎ দেখেছিল, ছাদে আর কেউ নেই, ও আর বিমান ছাড়া? একেবারে ভুলে যাবার কোনো কারণ নেই, ও তো মাতাল হয়ে যায়নি। কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য, সবাইকেই একটা পাগলামিতে পেয়ে বসেছিল। শ্যামল দক্ষিণের বারান্দায় রূপাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিল। আকাশে একটা ছোট চাঁদ ছিল,

কলেবর যার বাড়বার দিকে। তার মানে রূপার জন্ম শুক্লপক্ষে। আবছা আর বাঁকা জ্যোছ্‌না ছিল দক্ষিণের বারান্দায়। তখন কে বলে উঠেছিল, 'রূপা, তোকে সবাই আজ আমরা একটা করে চুমো খাবো।'

না, কোনো ছেলে বলেনি, মেয়েদের মধ্যে কেউ বলে উঠেছিল। না, ফুল্লরা ভুলে যায়নি, কেন ও আর বিমান ছাড়া ছাদে, সেই মুহূর্তে আর কেউ ছিল না। ছোট চাঁদের আবছা আলো। কৃষ্ণচূড়ার ছায়াটা বেশ বড় হয়ে ছাদের বুকে ছড়িয়েছিল। সেই এক ভুল, ওরা ফুল্লরা আর বিমানকে একটু সুযোগ দিয়ে গিয়েছিল। বিমান কখন কী ভাবে হঠাৎ ফুল্লরার দুই উরুত প্রাণপণ শক্তিতে ঘন আবদ্ধে চেপে ধরেছিল, আর ও নিচু হয়ে বিমানের হাতটা এক হাতে চেপে ধরেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'না। বিমান ছাড়ো।'

বিমান তখন নরম কাদার বুকে, জংলি গাছের মূলে আগ্রাসী লোভে মুখ বাড়িয়ে দেওয়া শুয়োরের মতো। ও যে কোন্ মুহূর্তে ওরকম একটা এ্যাটেমপ্ট নিয়েছিল যা আর কখনো করেনি, ফুল্লরা একটুও টের পায়নি। ও রীতিমতো ক্ষ্যাপা আর বলশালী হয়ে উঠেছিল, আর গোঙানো স্বরে একটা আকুতির শব্দ করেছিল। ওর হাত তখন অনেকখানি ভিতরে চলে গিয়েছিল; যেতে পেরেছিল, কারণ ও নিচু হয়ে কাণ্ডটা করেছিল একবারে আচমকা। ফুল্লরা ওর পরস্পর আবদ্ধ শক্ত উরুতে, বিমানের নখের আঘাত অনুভব করেছিল। শায়া আর শাড়ির ওপর দিয়ে ওর হাতটা ফুল্লরা প্রাণপণে চেপে ধরেছিল। এক হাতে অসম্ভব বুঝে দু'হাতে চেপে ধরেছিল, আর নিচু হয়ে পড়ার দরুন, বুকের আঁচল বিমানের পিঠের ওপরেই ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং গলার স্বর কিছুটা তুলে বলেছিল, 'ছাড়ো বলছি, ছাড়ো। আমি চিৎকার করবো।'

বিমান ছাড়েনি, কথা শোনেনি, বরং আর একটু দীর্ঘ শব্দে গুঙিয়ে উঠেছিল। কিন্তু ফুল্লরা মরীয়া হয়ে উঠেছিল। এমন অসুবিধাজনক

ভাবে ওকে বিমানের হাতটা চেপে ধরতে হয়েছিল, কোমর থেকে শাড়ির বাঁধন একটু একটু করে খসে পড়ছিল। বিমানের হাত ক্রমাগত ওর উরু সঙ্গমের দিকে তিল তিল করে এগিয়ে যাচ্ছিল। ফুল্লরা খানিকটা নিরুপায় হয়ে, হঠাৎ খানিকটা ঝুঁকে, বিমানের মাথার সঙ্গে মাথা ঠুকিয়ে ওর হাত দুটো সহ ঝুলে পড়েছিল। ওর শরীরের একটা ভার আছে, সেই ভারটা বিমানের ওপর কিছুটা চেপে বসতেই, হাত দুটোও কিছুটা নেমে এসেছিল। ফুল্লরা বেশ জোবে ফুঁসে ওঠা স্বরে ডেকে উঠেছিল, 'বিমান ছাড়ো!'

বিমানেব অন্য হাতটা তখনই ফুল্লবার বুকে স্পর্শ করেছিল। সেটা নতুন কিছু না, কিন্তু ফুল্লরার কাছে তখন সেই চেনা স্পর্শও অসহ্য বোধ হয়েছিল। ও হঠাৎ খানিকটা পিছনে ছিটকে যেতে পেরেছিল, আর, প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল, 'না, আর না, ছাড়ো।'

ফুল্লরার শাড়ি তখন অনেকখানিই ছাদে লুটোচ্ছিল। বিমান জানু পাতা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, এবং ফুল্লরার ছড়ানো আঁচল ধরে টানতে টানতে ওর দিকে এগিয়েছিল। বিমান তখন স্থান কাল পাত্র হিতাহিত সবই ভুলে গিয়েছিল। ফুল্লরাকে আর একবার হাত বাড়িয়ে ধরবার মুহূর্তে কমল নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছিল। ও খুব আস্তে আস্তে এসেছিল, নিশ্চয় অনেক দ্বিধা আর বিস্ময় নিয়ে। ওকে দেখতে পেয়েই, ফুল্লরা প্রায় আর্তনাদের স্বরে বলে উঠেছিল, 'কমল, সেভ্ মী প্লিজ! এর হাত থেকে আমাকে ছাড়াও। ও যে কী জঘন্য!'

কমল তথাপি দ্বিধা করেছিল, কারণ ব্যাপারটা ছিল ফুল্লরা আর বিমানের। ফুল্লরা আবার ডেকে উঠেছিল, 'কমল!'

কমল এগিয়ে এসে বিমানের একটা হাত চেপে ধরেছিল, নিচু স্বরে বলেছিল, 'এই বিমান এই। ফুল্লরা কী বলছে শোন্।'

বিমান শুনতে চায়নি, কমলের হাত থেকে এক ঝাপটায় হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল, আর সেটাই সপাটে গিয়ে লেগেছিল ফুল্লরার কাঁধের

কাছে। ফুল্লরা একটা অস্ফুট শব্দ করে উঠেছিল, 'ওর মাথায় কিছু নেই, একটা দাঁতাল হয়ে উঠেছে।'

কমল তখন দ্বিধা-মুক্ত হয়েছিল, আর বিমানের ওরকম ভাবে হাত ছাড়িয়ে নেওয়ায়, ওর জেদও নিশ্চয় ঝলকিয়ে উঠেছিল। ফুল্লরাব গায়ে ওবকম আঘাত লাগতে দেখেও, ও বেগে উঠেছিল। ও দ্রুত হাত বাড়িয়ে, বিমানের একটা হাত চেপে ধরেছিল, আর বেশ জোরে মোচড় দিযে টানতে টানতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বিমান ব্যথায় কয়েকবাব শব্দ কবে উঠেছিল, 'উহ্! উহ্!'···কিন্তু কমল আব থামেনি, বিমানকে টানতে টানতে একেবারে সিঁড়ির দরজাব কাছে নিয়ে, নিচেব দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তারপর ফুল্লবার দিকে তাকিয়ে ছিল।

ফুল্লরা তখনই যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, আলসেব কাছে সরে গিযে, পিঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আঁচলটা গায়ে টেনে তুলে দিতেও পাবছিল না। কমল দরজার কাছ থেকেই, নিচু স্বরে বলেছিল ফুল্লরা, ও নিচে নেমে গেছে, তুমি এসো।'

ফুল্লবা তখন নড়তে পাবছিল না, আর মনের যতো বাগ আর অপমান, সব গলার কাছ থেকে চাপা হু-হু শব্দে বেরিয়ে আসছিল। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করে দিয়ে, জলে ভরে উঠছিল। কমল নিশ্চয় চাপা কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছিল, আব তাই ফুল্লরার কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। কিছুটা অবাক আর উদ্বিগ্ন স্বরে ডেকেছিল, 'ফুল্লরা।'

ওভাবে তখন নাম ধরে যে-কেউ ডাকতে পারতো। যেন একটা ডাকেরই অপেক্ষা ছিল, ফুল্লরার গলায় কান্নার স্বর ফুটছিল। কমল ওর একটা হাত ধরে বলেছিল, 'ফুল্লরা, তোমার কি কোথাও লেগেছে?'

ফুল্লরা কমলের হাতটা নিজের দুই ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে, কান্নার শব্দ চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল, আর একজন বন্ধুর কাঁধে ও একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। হ্যাঁ, ফুল্লরা কমলের কাঁধে একটা হাত তুলে দিয়েছিল, যে হাতটা কমল নিজেও চেপে ধরেছিল। আর সেইজন্য

কি কমল ওই ভাবে কথাটা বললো, যেন একটা চ্যালেঞ্জের সুরে, 'তা হলে রূপাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা আমি বলতে পাবি।'

কোন্ সূত্রে? স্বেদসিক্ত রমণী—রূপাদের বাড়ি, রূপাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা! কমলের হাসিতে কি বিদ্রূপ? ব্যঙ্গ? কী ভাবে কী ভেবে ও কথাটা বললো?

বাসে একটা ঝাঁকুনি লাগলো, ফুল্লরার কানে এলো একটা শব্দ, 'লোধাশুলি।'

॥ তেরো ॥

কমলের সম্পর্কে এরকম ভাবতে খারাপ লাগে। বিবেক বা সেই রকম কিছু ফুল্লরার মধ্যে জেগে ওঠে কী না, ও তা বুঝতে পারে না, কমল সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবতে, মনের মধ্যে আপনা থেকেই কেমন একটা দ্বিধার ছায়া পড়ে। কমল যদি সত্যি চ্যালেঞ্জ করে কথাটা বলে থাকে, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ করে থাকে, সেটা তো একরকমের নীচতা বলতে হবে। এই কমল এখন এক আলাদা জগতের মানুষ, যদিও ওর কথাবার্তা শুনে, ওর হাসি দেখে, হঠাৎ, হঠাৎ কিছু বোঝা যায় না। বরং ওর বর্তমানকে ঘিরে যে-সব বিভীষিকা জড়ানো—ফুল্লরার এইরকম ধারণা তারপরেও এইরকম হেসে কথাবার্তা বলাটা কেমন একটু অপ্রত্যাশিত। ওর বাঁ দিকের কোমরের কাছে কী লুকানো আছে, ফুল্লরা তা অনুমান করতে পারে। ও কেন কিছুক্ষণ আগে কোমরের কাছে শক্ত হাতে চেপে ধরেছিল, ফুল্লরা তাও আন্দাজ করতে পারে। ওকে ঘিরে ত্রাসাচ্ছাদিত ভয়ংকর কিছু ছাড়া ভাবা যায় না, অবিশ্যি, আর এসবের মধ্যেই ওকে শ্রদ্ধেয় আর মহৎ মনে হয়, আর ফুল্লরার সঙ্গে ওর ব্যবধানটাও সেইখানেই। সেইজন্যই ওকে আগের মতো হেসে কথা বলতে শুনলে আশ্চর্য লাগে।

তথাপি, সংশয় কি কাটে? কাটে না। ফুল্লরার মনের ধোঁয়া সরে যেতে থাকে, আর আগুন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জ্বলুনি বাড়তে থাকে, অপমানের জ্বালা, কারণ রূপাদের বাড়ির ঘটনার পর, আট মাসের জীবনটা এখন খুব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেই সময়টা ভুলে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, ফুল্লরা ভুলেও গিয়েছিল, যদিও সত্যি সবকিছু ভোলা

যায় না। তাহলে এখন এরকম স্পষ্ট হয়ে উঠতো না। সেই আট মাস তো এখন একটা ভবিষ্যতের নিশ্চিত ছবি ফুটিয়ে তুলেছিল। প্রায় একটা সিদ্ধান্তের মতো।

ফুল্লরা সরাসরি মুখ ফিরিয়ে কমলের দিকে তাকালো না। ঘাড় ঈষৎ বাঁকিয়ে, চোখের কোণে দেখলো। কমল বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। এখনও জানালার পাশে, বাতাসে ওর চুল উড়ছে, দাড়ি কাঁপছে। ও কি চোখ বুজে আছে? একটা উৎকট সন্দেহের উত্তেজনার অবসানে ও কি এখন চোখ বুজে আলস্যে কাটাচ্ছে? মনে হয় না। ও এখনো সোজা হয়ে বসে আছে, আর মনে হচ্ছে, কী এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। ও এখন পুরীগামী বাসের মধ্যে নেই, অন্য কোথাও রয়েছে, ফুল্লরার ঠিক এইরকম মনে হলো। রূপাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা যে ও বলেছিল, এখন সেসব নিশ্চয়ই মনে নেই, ভাবছেও না। এরকম ভাবেই ও প্রায় দু বছর আগে, অন্য এক জীবনে চলে গিয়েছিল। কষ্ট? খুবই কষ্ট হয়েছিল ফুল্লরার। কিন্তু নালিশ করার কথা মনে আসেনি। মনে কোনো নালিশই জাগেনি।

এখন জাগছে। কারণ এখন প্রশ্নটা স্বতন্ত্র। এখন কমলের কথার ব্যাখ্যার দরকার আছে। কোনো কোনো সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু তা নিয়ে বিদ্রূপ করার অধিকার থাকতে পারে না।

ফুল্লরার ঠোঁটের দুই কোণ শক্ত হয়ে উঠলো, আর ঠোঁটের ডগায় জিজ্ঞাসা উদ্যত হলো। তবুও একবার কুমারের দিকে ফিরে তাকালো। কুমারদার হাতে খোলা ম্যাগাজিন, তার চোখও সেইদিকে ছিল। কিন্তু ফুল্লরা তার দিকে তাকানো মাত্রই, সে চোখ তুললো। তার দুই চোখে জিজ্ঞাসা। বুবাই ওর মায়ের বুকের কাছে মাথা এলিয়ে দিয়েছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। অমুর দৃষ্টিও বাইরের দিকে। কুমারের ভুরু কুঁচকে উঠলো। ফুল্লরা কমলের দিকে মুখ ফেরালো।

'এর পরে পর পর দুটো চেক পোস্টি পড়বে।' কমল ফুল্লরার দিকে

ফিরে নিচু স্বরে বললো, 'চিচ্‌রা আর দারিশোল। তারপরে জামহোলা সুবর্ণরেখা ব্রিজ, তাই না?'

ফুল্লরার চোখের স্বচ্ছ সান গ্লাসে কোনো কৌতূহল নেই, বললো, 'জানি না।'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।' কমল বললো, 'আমি জানি, আমার সব মুখস্থ আছে। তবু তোমাকে তখন নেকস্ট স্টপেজের কথা ইচ্ছে করেই জিজ্ঞেস করেছিলাম। যদি তুমি আমাকে চিনতে পারো।' ও হাসলো, আবার বলল। 'সুবর্ণরেখা পার হলে আমরা উড়িষ্যায় পড়বো। তার আগে, চেক পোস্ট দুটো—।' ও কথা শেষ করলো না, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ ফেরালো।

ও ওর নিজের ভাবনায় আছে, ফুল্লরা বুঝতে পারছে। পর পর দুটো চেকপোস্ট ওর মাথায় ঘুরছে। বোধ হয় সেখানে বিপদের সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ করছে। উড়িষ্যায় পৌঁছুলে কি ওর বিপদ কেটে যাবে? তা যা-ই হোক, এসব সম্ভাবনা নিয়ে, আপাততঃ ফুল্লরার মনে কোনো কৌতূহল বা উত্তেজনা জাগছে না। ওর বাঁ কনুইটা এখনো হাতলের ওপরে, কমলের কোমরের কাছে ছুঁয়ে আছে। ও কনুই দিয়ে আলতোভাবে কমলের কোমরে একটু চাপ দিয়ে বললো, 'তখন তুমি ও কথা বলছিলে কেন?'

'কোন্ কথা?' কমল মুখ ফেরালো, ওর কালো ঠুলিতে জিজ্ঞাসা।

ফুল্লরা বললো, 'রূপাদের বাড়ির সেই রাত্রের কথা?'

'তোমার কথা শুনে মনে পড়ে গেল।' কমল হাসলো, ঈষৎ ঝুঁকে বললো, 'তুমি যে স্বেদসিক্ত রমণীর অভিজ্ঞতার কথা বলছিলে, তাই।'

ফুল্লরার মুখে রক্তের ছটা লেগে গেল, দু চোখ ঝলকিয়ে উঠলো, গম্ভীর আর তীক্ষ্ণ নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কী তোমার অভিজ্ঞতা?'

কমল কোনো জবাব না দিয়ে, কেবল হাসলো। ওর ঝকঝকে

দাঁত দেখা গেল। হেসে, জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবার উদ্যোগ করতেই, ফুল্লরা দ্রুত ধারালো স্বরে বলে উঠলো, 'বলো, তোমার বলা উচিত, কী তোমার অভিজ্ঞতা।'

কমল ফিরে তাকালো, ওর চোখের ঠুলির ভিতর থেকে, কপালে একটা রেখা বেঁকে উঠলো। তারপরে চোখ থেকে ঠুলিটা আস্তে আস্তে খুলে, চকিতেই একবার আশেপাশে দেখে নিয়ে, ফুল্লরার দিকে তাকালো। মোটা ভুরুর নিচে, ওর দু চোখে বিভ্রান্ত বিস্ময়। ফুল্লরাও ওর চোখের দিকে তাকালো। ফুল্লরার মুখে রক্তাভা এখন আরো গাঢ়, নাকের পাটা কাঁপছে। কমল অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি রেগে গ্যাছো নাকি?'

ফুল্লরা তার কোনো জবাব না দিয়ে বললো, 'আমি তোমার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাই।'

কমলের হাসিটা হয়ে উঠলো কেমন আড়ষ্ট, অবাক চোখে মুখে নেমে এলো একটা ম্লানতার ছায়া। হাতের ঠুলিটা সহ, একবার গালে স্পর্শ করলো, তারপরে বললো 'তুমি খুব ঘেমেছিলে, তাই না? রূপাদের ছাদের কথা বলছি। আমার ঘাড়ে আর গালে তোমার ঘাম লেগেছিল, এখনো স্পষ্ট টের পাই। এখন বলছি, আর এখনো সেই স্পর্শ শিরশির করছে, এই আমার অভিজ্ঞতা।'

ফুল্লরার চোখ কমলের চোখের ওপর। কমলের অবাক ম্লান চোখে অনুসন্ধিৎসা। ফুল্লরার মনে হলো, ওর বুকের কাছে নিশ্বাস আটকে আসছে। এখন ওর মন চকিতেই উজানে ফিরেছে, আর তার একটা তীব্র টান ওর পাঁজরে লাগছে। ভ্রান্তি আর অপরাধবোধ আর স্মৃতি একসঙ্গে ওকে উজানে ঠেলে দিয়েছে। ও ঠোঁটে ঠোঁট টিপলো, বুঝতে পারছে, ওর চোখে জল আসছে।

'কেন রাগ করলে?' কমলের স্বরে এখনো আহত বিস্ময়।

ফুল্লরা আর তাকিয়ে থাকতে পারলো না, কমলের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে, মুখ নামালো। দৃষ্টি দ্রুত ঝাপসা হয়ে উঠছে। কমলের কোমরের

কাছে স্পর্শিত ওর হাত নেমে গেল, কমলের কোলের কাছে জামার অংশ মুঠি পাকিয়ে ধরলো।

কমল ফুল্লরার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো । ওর ঝকঝকে চোখের ওপর দিয়ে, কয়েকটা পর্দা যেন নিমেষে সরে যেতে লাগলো। সহজ হয়ে উঠলো আড়ষ্ট হাসি, ম্লান ছায়া কেটে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখলো, ওর জামা মুঠি করে ধরা ফুল্লরার হাত। পর মুহূর্তেই ও কেমন সচেতন হয়ে উঠলো, সোজা তাকালো কুমারের দিকে। কুমার তার অপলক দৃষ্টি ফেরাবার সময় পেলো না, খুব অপ্রস্তুত হয়ে উঠলো। কমল দু পাশ ঢাকা ঠুলিটা এঁটে নিল চোখে। কিছু না বলে, ওর ঠুলি চোখ ফুল্লরাকে আর একবার দেখে, আবার ফিরলো জামা ধরা মুঠির দিকে। ওর হাত একবারের জন্য ফুল্লরার মুঠির দিকে নেমে আসতে গিয়ে থমকিয়ে গেল, সামনের আসনের পিছনের রডে রাখলো।

সময় বয়ে যেতে লাগলো। দু পাশের মাঠে, দূরের আবছা বনে গর্জন ছড়িয়ে দিয়ে, বাস ছুটছে। কোনো কোনো আসনে নানা কথার টুকরো। ফুল্লরার সান গ্লাসের ফ্রেমে জলের ফোঁটা ঠেকে আছে, এখনো মুখ তুলতে পারছে না। বিস্মৃতির পর্দা কমলের কথার ছুরিতে ফালা ফালা। অথচ ও মনে করেছিল, স্বাভাবিক ভাবেই কমলকে ভুলে গিয়েছিল। কমলের অস্তিত্ব অবাস্তব হয়ে উঠেছিল। মিথ্যা ধারণা আর বিশ্বাস, সামান্য কথাতেই কী রকম ভেঙে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যায়। ওর মনে, অপরাধবোধ এখন একটা বিরাট লজ্জা হয়ে উঠছে আর কমলের মতোই ওর সারা গায়ে শিরশির করছে, আর সমস্ত মনটা আবেগে থরথর করছে। কমলকে এখন ও কী বলবে?

'দু-এক মাস আগেও, এসব কথা এভাবে বলা আমার নিজের কাছেও খুব নিন্দনীয় ছিল।' কমল ওর সেই বিশিষ্ট নিচু স্বরে বললো, 'আসলে আমি জীবনের অনেক কিছুকেই মূল্যহীন বলে ধরে নিতে শিখেছিলাম। ইভ্যানজেলের মতো, পবিত্র সব বাণী। এরকম প্রটেস্টান্ট হবার কোনো অর্থ নেই। যতটা সম্ভব পুরোপুরি একটা মানুষ, কোনো

বড় কাজ-টাজ করতে পারে, রক্ষা করা, হত্যা করা, সব কিছু বোধ হয় তারাই করতে পারে। আন্‌কমন হবো বলে কেউ তা হতে পারে না, তাই না? কমনসেন্স হচ্ছে গ্রেটার সেন্স, তাই তো, না কী?'

ফুল্লরা কমলকে দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো। কমল কথা বলছে। কেন বলছে, কী বলছে, ও কিছুই ঠিক বুঝতে পারছে না। ও ঠিক আগের মতো কথা বলছে। আগে ওর ভাবনা-চিন্তার কথা যেরকম বলতো, আর সব কথাতেই একটা জিজ্ঞাসা, অন্যের মতামতকে জানতে চাওয়া। ফুল্লরা ওর দিকে ফিরে তাকালো। কমল হাসছে, আর ওর চোখের কালো ঠুলিতে কেমন একটা কৌতুকের ঝিলিক। বললো, 'তোমার সানগ্লাস মোছ।'

ফুল্লরার মুখে আবার লজ্জার ছটা লেগে গেল। কমলের জামা মুঠি করে ধরা হাতটা তুলে, তাড়াতাড়ি সানগ্লাস খুললো। মুখ নামিয়ে, আঁচল দিয়ে চেপে চেপে চোখ মুছলো, আর চোখের কোল। কমল আসলে ওকে চোখ মুছতেই বলেছে, উচ্চারণ করেছে সানগ্লাস। তবু ও সানগ্লাসটাও মুছলো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুখ তুলে, সহজভাবে তাকাতে পারলো না।

কমল আবার বললো, 'এসব কথা থাক। আসলে আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম জানো?'

ফুল্লরা মুখ তুলে তাকালো। কমল হেসে বললো, 'তুমি যে তখন বলছিলে, আমি আমার অভিজ্ঞতার বিষয়ে মিথ্যা কথা বলছি, সেটা ঠিকই বলেছ। স্বেদসিক্ত রমণীর অভিজ্ঞতা আমার বেশ ভালোই আছে।'

ফুল্লরার ভুরু জোড়া অবাক জিজ্ঞাসায় একবার কেঁপে উঠলো। কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকালো। কমল বললো, 'শান্তিনিকেতনে বেলুদিদের বাড়িতে—'

ফুল্লরার মুখে গাঢ়-রক্তাভা ছড়িয়ে পড়লো। ও ভুল করে, প্রায় কমলের নাম ধরে ডেকে উঠতে যাচ্ছিল। কোনোরকমে উচ্চারণ

করলো, 'যাহ্!' তারপরে মুখ নামিয়ে নিল। আর মনে হলো, ওর স্বেদাক্ত খোলা বুকে, কমলের তপ্ত গাল চেপে রাখা রয়েছে। ওর সারা গায়ে একটা শিহরণের তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগলো। এসব কী আশ্চর্য ব্যাপার, আর অবিশ্বাস্য। কমল এখনো সেই সব কথা মনে রেখেছে। ফুল্লরার ধারণা ছিল, ও নিজেই সব ভুলে গিয়েছে। অথচ উচ্চারণের অপেক্ষা মাত্র, সবই কেমন তীব্র বাস্তবতায় ওকে আচ্ছন্ন করে তুলছে। ওর নিজের কাছেও, জীবনের সেটা একটা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। কিন্তু এসব কথা মনে রেখে ও বলেনি, কমল মিথ্যা কথা বলছে। কিংবা এসবই হয়তো ওর অবচেতনে ছিল, আর তা-ই খুব জোরের সঙ্গে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, কমল মিথ্যা কথা বলছে।

গাড়িটার গতি কি মন্থর হয়ে আসছে? তবু ফুল্লরা কোনো দিকে তাকিয়ে দেখলো না। শান্তিনিকেতনে, বেলুদির বাড়ির সেই আশ্চর্য অলৌকিক দুপুরের কথা, ওর সমস্ত স্মৃতি উদ্ভাসিত করে ভেসে উঠলো। রূপার জন্মদিনের এক মাস পরের ঘটনা সেটা। ছাদের সেই ঘটনার পরে, মাত্র কয়েকটা দিনই একটু হালকা হাসি ঠাট্টায় কেটেছিল। ফুল্লরা বিমান সম্পর্কে ওর মনোভাবের কথা কমলকে বলেছিল, খুব স্পষ্ট ভাবেই বলেছিল, বিমানকে ও যা মনে করেছিল, তার কিছুই ওর মধ্যে ছিল না। ও জোর করে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল, বিমানের মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। ওর মনে যখন পূর্ণ মাত্রায় অবিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠেছিল, তখনো ও নিজের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করেছে। কারণ, বিমানের ব্যর্থতা, অনেকটা যেন ওর নিজের পরাজয় বলে মনে হয়েছিল। ও যখন অনুভব করেছিল, বিমানকে ও ভালবাসে না, তখনো বিমানের সমস্ত ইচ্ছাকে ও মেটাতে দিয়েছে।

কমল প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি, পরিষ্কার হেসে বলেছিল, 'তোমার মুখ থেকে একথা শুনে, স্রেফ একটা স্টান্টের মতো লাগছে।'

'কিন্তু যা সত্যি, তাই তোমাকে বললাম।' ফুল্লরা বলেছিল, 'স্টান্ট

তোমাকে না, আমি আমার নিজেকেই এতদিন স্টাণ্ট দিয়ে এসেছি। আসলে সবটাই ছিল আমার মনগড়া। ব্যাপারটা সব আমারই। এক ধরনের সেল্‌ফ-হিপনোটিজম্‌ বলতে পারো। বিমানের তাতে কোনো কিছুই ছিল না। ওর যা নেবার, ও তা নিচ্ছিল, বোধ হয় ভাবছিল, ও অনেক কিছু আমার কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে। আমরা মেয়েরাও তো তাই ভাবি। ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে গেলে, আর সেটাকে যদি প্রেম মনে করি। তার জন্য একটা ছেলেকে যা দিতে হয়, সেটাকে তো অনেক কিছু দেওয়াই বলে। কিন্তু একটা সময় আসে, যখন আর কিছুতেই মিথ্যাকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না। আর সেটাই তো ঘটলো রূপাদের ছাদে।'

কমল অবাক চোখে তা কয়ে বলেছিল, 'অথচ, আমরা দোতলায় সবাই তোমাদের দুজনকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তোমাদের দুজনকে আমরা সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। নেহাত রূপার মা দোতলায় এসে পড়েছিলেন বলে, আমি তোমাদের ডাকতে গিয়েছিলাম। রূপাই আমাকে চুপিচুপি তোমাদের ডেকে আনতে বলেছিল।'

'আর তুমি যদি তখন না যেতে, তাহলে একটা যাচ্ছেতাই ঘটনা ঘটে যেতো।' ফুল্লরা বলেছিল। 'বিমান ওর নিজের ভুল বুঝতে পারতো না, ভাবতো আমি লজ্জা পেয়েছি, আর ওর রাইট আছে ভেবে, একটা বিশ্রী কাণ্ড করতো।'

কমল কেমন উৎসুক কৌতূহলে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বিশ্রী কাণ্ড কী ঘটতো?'

'কী ঘটতো না?' ফুল্লরা বলেছিল, 'ওকে আমার কামড়ে খিমচে দিতে হতো, আমার জামাকাপড় ছিঁড়ে লুটোপুটি যেতো, আর আমার চিৎকারে রূপাদের বাড়ির সবাই এসে পড়তো।'

কমল বলেছিল, 'অথচ আমি নিজেই কতোদিন দেখেছি, বিমানকে পেলে, তুমি আর কোনো দিকে ফিরে তাকাতে না। তোমাদের দুজনকে নিয়ে আমরা সবাই এক কথা বলতাম, আর ভাবতাম,

তোমাদের বিয়ে হবে। আর সেইজন্য তোমাকে আমরা সব সময় আলাদা চোখে দেখতাম।'

'তোমাদের কোনো দোষ ছিল না।' ফুল্লরা বলেছিল, 'আমি নিজেকেই যে সেরকম ভাবতাম, তোমাদের আর কী উপায় ছিল।'

কমল হেসে বলেছিল, 'আশ্চর্য, তোমাদের সত্যি মিথ্যা কিছু বোঝবার উপায় নেই। এটা তো ভারি মুশকিলের কথা।'

ফুল্লরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?'

'কেন নয়?' কমল বলেছিল, 'অনেকদিন ধরে জানলাম, একটা মেয়ে আমাকে ভালবাসে, তারপরে হঠাৎ একদিন সে দাঁত বসিয়ে কামড়ে দিল।'

ফুল্লরা খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'তা সেই মেয়েটাকে যদি তুমি বুঝতে না পারো, আগাগোড়াই ভুল করে যাও, হঠাৎ এরকম ঘটতে পারে। বিমানের তো ওসব বোঝাবুঝির কোনো দায়ই ছিল না।'

'তুমিও বুঝতে দাওনি।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'আর কী ভাবে বুঝতে দেওয়া যায়? একটা মেয়ে আর কী ভাবে বুঝতে দিতে পারে?'

'কিন্তু সেল্‌ফ-হিপনোটিজম্ ব্যাপারটা একটু এ্যাবনরমাল নয় কী?' কমল ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'হতে পারে। কিন্তু সব সময়েই অবিশ্বাস ঠিক না। নিজেকে বোঝাবার দরকার হয়, আমি হয়তো ভুল করছি। আমি হয়তো বুঝতে পারছি না।'

'তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ, কিন্তু আমি খুব বোকা বনে গেছি।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তার মানে?'

'তার মানে, ঠকে গেছি, তাই না?' কমল ঘাড় কাত করে বলেছিল, 'আমরা কেউ তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করিনি।'

ফুল্লরা হেসে উঠে বলেছিল, 'এখন থেকে করবে নাকি ?'

'তা একটু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী ?' কমল গম্ভীর স্বরে বলেছিল।

ফুল্লরা খিলখিল করে হেসে উঠে, হাত তুলেছিল। কমল তাড়াতাড়ি মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিল। তখন তো সব ছেলেমেয়ের মধ্যেই একটু প্রেম প্রেম খেলা ছিল। যদিও সে-সব সীরিয়াস কিছু না। কিন্তু খেলা, হাসি সব কিছু ছাড়িয়ে, কমলের অবস্থান বদলিয়ে গিয়েছিল। ফুল্লরা সম্যক কিছু বুঝে ওঠার আগেই, কমল খুব নিবিড় করে এগিয়ে আসছিল, আর ফুল্লরা তা প্রথম বুঝতে পেরেছিল, ওর প্রতি কমলের নিবিড় অনুসন্ধিৎসা থেকে। শান্তিনিকেতনে পূর্ব পল্লীতে বেলুদির বাড়ির এক অলৌকিক দুপুরে, এক নির্বাক নৈঃশব্দ্যে সেই অনুসন্ধিৎসা ফুটে উঠেছিল।

॥ চোদ্দ ॥

বেলুদি শ্যামলের দিদি। শ্যামল ফুল্লরাদের বন্ধু। ফুল্লরা যখন কমলের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বেলুদির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল, তার মাত্র মাস ছয়েক আগে বেলুদি বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনে চাকরি নিয়ে কলকাতা থেকে চলে গিয়েছিলেন। ঘটনাটা ফুল্লরাদের কাছে ছিল কিছুটা অবাক—চমক লাগানো। বেলুদি আর শিবতোষদা—বেলুদির স্বামী, দুজনে কলকাতার একই কো-এডুকেশান কলেজে পড়াতেন। বেলুদির একমাত্র সন্তান, একটি মেয়ে তখনো ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়তো। শ্যামলও বেলুদির প্রায় সন্তানের মতোই। বেলুদির দুই দাদা থাকতেও, পিতৃমাতৃহীন ভাইটির দায়িত্ব ছেলেবেলা থেকে তিনিই নিয়েছিলেন।

বেলুদির সঙ্গে ফুল্লরা আর ওদের গ্রুপের সব ছেলে ও মেয়ে বন্ধুদের যোগসূত্র শ্যামল। বেলুদির বাড়িতে শ্যামলের বন্ধুদের সকলেরই অবাধ গতি ছিল। সঙ্গে শ্যামল না থাকলেও, যাতায়াতের কোনো অসুবিধা ছিল না। ফুল্লরাদের মনে হতো, যে-কোনো সময়ই বেলুদি যেন ওদের পথ চেয়ে বসে আছেন। আসলে বেলুদি তাঁর অবকাশের যে-কোনো সময়েই ফুল্লরাদের সঙ্গে গান করে, গল্প করে কাটিয়ে দিতে ভালবাসতেন। শিবতোষদাও বাদ যেতেন না। বেলুদির মেয়ে চন্দনা তো নয়-ই। তবে হাসি হাসি মুখ, ভারি চেহারার শিবতোষদা কথাবার্তা কম বলতেন। অথচ মাঝে মাঝে এমন হাসির গল্প বলতেন, ভাবাই যেতো না, শিবতোষদার মতো লোকের ভিতরে এতো হাসি-উচ্ছল-সরসতা আছে।

তুলনায় বেলুদি প্রচুর কথা বলতেন, অজস্র হাসতেন, তার মধ্যেই ছুটে ছুটে কাজও করতেন, কিন্তু এক এক সময় তাঁর হাসির মধ্যেই, কোথায় একটা গাম্ভীর্যের সুর ফুটে উঠতো, আর খুব সীরিয়াস কথা, খুব সহজভাবে বলতেন। তাঁর কিছু কিছু কথা এখনো ফুল্লরার কানে লেগে আছে। "তোমরা যে-যাই ইজম্ টিজম্ নিয়ে থাকো, আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু কোনো বিষয়েই এ্যাভারেজ না হওয়ার চেষ্টা করো। তা সে রাজনীতি করো, গান করো, কবিতা লেখ বা মাঠে ময়দানে খেলতে যাও। জীবনটা অনায়াসে বয়ে যাবে, এরকম ভাবাটাই ভুল।" …"যার বিশ্বাস নেই, তার কিছুই নেই। ঈশ্বরে হোক, অথবা নিরীশ্বর বস্তুবাদী হও, হিংসা-অহিংসা, যাই বলো, বিশ্বাস একটা থাকা চাই।" …"উদ্দেশ্যহীন লেখাপড়া করার থেকে না-করা অনেক ভালো। আর উদ্দেশ্য যদি কেবল শিক্ষা না হয়ে চাকরির জন্য হয়, তা হলে চুরি না করে উপায় নেই। ওটা একটা ঘৃণ্য ব্যাপার। নামেই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ানো, আসলে অশিক্ষিত সাধারণ অদক্ষ মজুর ছাড়া ওরা কিছুই নয়।"…"রাজনীতি করা আর মানব-দরদী হওয়া এক কথা নয়।"

বেলুদি নানা কথাপ্রসঙ্গেই এই ধরনের কথা বলতেন। বিশেষ-ভাবে ভেবে চিন্তা করে কিছু বলতেন না। কথাগুলো ফুল্লরার মনে থাকার কি কারণ? বেলুদির কোনো কথাই কি ওর জীবনে কাজে লেগেছে? বুঝতে পারে না। কিন্তু একটা বিষয় ও বুঝতে পারতো। বেলুদি ছিলেন ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাসী, আর একেবারে বিপরীত ছিল শ্যামল। ওর কোনোরকম ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না। ফলে, বেলুদির সঙ্গে সব থেকে বেশি তর্ক লাগতো শ্যামলেরই। শিবতোষদাকে ঠিক মতো বোঝা যেতো না। কারণ তিনি কখনো তর্কে যোগ দিতেন না।

বেলুদি পড়াশোনা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। ছুটি-ছাটায় প্রায়ই বেলুদি আর শিবতোষদা, চন্দনাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে যেতেন। তা

ছাড়া শান্তিনিকেতনের বিশেষ কয়েকটি উৎসবে তো যেতেনই। ব্যতি-ক্রম ছিল শ্যামল। ওর শান্তিনিকেতনের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। অথচ ফুল্লরা ছাড়া, ওদের বন্ধুরা সকলেই কোনো না কোনো উপলক্ষে, দু একবার অন্ততঃ বেলুদির সঙ্গে শান্তিনিকেতনে গিয়েছে। শ্যামলের মতো কোনো বিরাগ ওর ছিল না। নিতান্তই কোনো না কোনো কারণে বাধা পড়েছে, যাওয়া হয়নি, আর বন্ধুদের কাছে শান্তি-নিকেতনের গল্প শুনে, ওর মন খুব খারাপ হয়ে যেতো।

বেলুদির বাবা শান্তিনিকেতনের পূর্বপল্লীতে একটি বাড়ি করে-ছিলেন। বিশ্বভারতীর কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না। বিপত্নীক ভদ্রলোক রবীন্দ্র-প্রেমিক ছিলেন, শান্তিনিকেতনকে ভালবাসতেন। সরকারি পদস্থ চাকরি থেকে অবসরের পর, শান্তি-নিকেতনে বাড়ি করে, বাকি জীবনটা কাটিয়েছিলেন। নিজেদের বাড়ি থাকাতেই বেলুদিদের যখন তখন যাওয়ার সুবিধা ছিল। বাড়িটা কখনো ভাড়া দেওয়া হয়নি।

কিন্তু কলকাতা কলেজের চাকরি ছেড়ে, বেলুদির শান্তিনিকেতনের চাকরির চেষ্টা বা সিদ্ধান্ত কবে কী ভাবে নেওয়া হয়েছিল, ফুল্লরারা কিছুই জানতে পারে নি। শ্যামলও ওদের কিছু বলেনি। কোথাও একটা কিছু গোলমাল ঘটেছিল, সন্দেহ নেই। কারণ শিবতোষদা শ্যামলকে নিয়ে থাকবেন কলকাতায়, আর বেলুদি চন্দনাকে নিয়ে থাকবেন শান্তিনিকেতনে। ভেবেই ফুল্লরার মনে অস্বস্তি হয়েছিল। অস্বস্তি হয়েছিল, ওদের সব বন্ধুদেরই। গোলমালের সন্দেহটা বাড়িয়ে দিয়েছিল শ্যামলই, বন্ধুদের কাছে বিষয়টি নিয়ে একটি কথাও না বলে। শ্যামল এমন একটা ভাব করেছিল। যেন ও কিছুই জানে না। বলবার মতো ঘটেনি কিছুই। যেন খুবই একটা সহজ ব্যাপার।

বেলুদিও অবিশ্যি সেইরকম ভাবই দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর মতো হেসে বলেছিলেন, 'পাথরপুরী কলকাতা ছেড়ে এবার শান্তি-নিকেতনে। সেখানে তোমাদের রোজ নিমন্ত্রণ। যেদিন খুশি, যখন

খুশি, যতোজন খুশি। ঠিক কলকাতার মতোই। চোখের বাইরে চলে গেলেই যেন, বেলুদি তোমাদের মনের বাইরে না চলে যায়।' শেষের কথাটা বলার সময় কি বেলুদির গলা একটু ধরে এসেছিল? বোধহয়। কিংবা ফুল্লরার নিজেরই গলার কাছে কিছু ঠেকে গিয়েছিল। আশ্চর্য, শিবতোষদাও তখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'তোমাদের শিবতোষদাকে যেন তা বলে একেবারে নির্বাসন দিও না। তোমাদের দেবার মতো আমার ভাণ্ডারেও কিছু আছে।'

বেলুদি খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিলেন, 'সত্যি, আমি একটু একচোখোমি করে ফেললাম। এ বাড়িটাই তো আদি। অবিশ্যি শ্যামল থাকছে কলকাতায়, ওর সঙ্গে তো তোমরা এ বাড়িতে আসবেই। আমি একটু দূরে চলে যাচ্ছি বলেই বললাম।'

শ্যামল সামনে থেকেও, দিদি ভগ্নিপতির কথায় কোনোরকম মন্তব্য করেনি। বেলুদি আর শিবতোষদার হাসি, কথাবার্তায় বোঝা-ই যায়নি, দুজনের মধ্যে কোথাও একটা কিছু গোলমাল ঘটেছে। অবিশ্যি লোক-দেখানো প্রেমে ডগমগ দম্পতি তাঁরা কোনোকালেই ছিলেন না। কিন্তু একজনের কম কথা, আর একজনের অনেক, একজনের স্বল্প হাসি, আর একজনের কম কলকলানো, একজনের দৃষ্টি অচঞ্চল গভীর, আর একজনের বিদ্যুৎবিচ্ছুরিত চঞ্চল, যদিও অগভীর বলা যাবে না কোনো মতেই, তাঁদের মধ্যে যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া ছিল— যাকে বলে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং, সেটা পরিষ্কার বোঝা যেতো। তাঁদের ছাড়া-ছাড়ির দিনেও বিপরীত কিছু বোঝা যায়নি। ফুল্লরার কাছে সেটাই এক অবাক-জিজ্ঞাসা।

সেই থেকেই, ফুল্লরাদের কখনো দল বেঁধে, কখনো জোড়ায় বা একা শান্তিনিকেতনে বেলুদির বাড়ি যাওয়ার শুরু। ফুল্লরা কখনো দলের সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ করে উঠতে পারেনি। একবারই গিয়েছিল, কমলের সঙ্গে। গ্রীষ্মের ছুটির প্রাক্কালে, কমল হঠাৎ প্রস্তাবটা তুলেছিল, 'চলো ফুল্লরা, বেলুদির ওখানে দুটো দিন ঘুরে আসি।

সকলেরই কয়েক দফা করে যাওয়া-আসা হয়ে গেল, তোমার আর আমারই হয়নি।'

ফুল্লরা এক কথাতেই রাজী হয়ে গিয়েছিল। ও জানতো, গ্রীষ্মের ছুটিতে ওকে দেশের বাড়িতে যেতে হবে। অবিশ্যি, দিদি আর কুমারদার অনুমতির দরকার ছিল। দিদির থেকে কুমারদা-ই একটু বেশি সাবধানী। তবু অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। ওদের দুজনকে দেখে, বেলুদিও খুব খুশি হয়েছিলেন। চন্দনা এক পাক নেচে নিয়েছিল।

বেলুদি আর চন্দনা ছাড়া, বাড়িতে ছিল এক সাঁওতাল দম্পতি। বাড়ির পিছন দিকে তাদের দেড়খানি মাটির ঘরের সংসার ছিল। তারাই বেলুদির বাড়ি, এমনকি ঘরকন্নাও দেখাশোনা করতো। বেলুদি একবার সকালে, আর একবার ঘোর দুপুরে পড়াতে যেতেন। চন্দনার এগারোটায় ছুটি হয়ে যেতো। বেলুদি বিকালে ফিরে এলেই আসর জমতো। গল্পের আসর, বেড়াতে যাবার উন্মাদনা। দুটো দিন কেটেছিল, নতুন প্রকৃতির দূরস্পর্শী গভীরতায়, ঝর্নার মতো কলকল বেগে।

ফুল্লরা আর কমল দুদিন ছিল। তৃতীয়দিন ভোরের ট্রেনে ফিরে এসেছিল কলকাতায়। কমলের নিবিড় করে এগিয়ে আসাটা অতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল, ফিরে আসার আগের দিন দুপুরে। ইংরেজী মতে সেটা হয়তো অপরাহ্ণ। কিন্তু আসলে পূর্বপল্লীর বৈশাখের বেলা তখন তিনটা। সবুজ আর রক্তাভ রাঢ়ের সেই সময়টাকেই বোধহয় নিদাঘ দুপুর বলা যায়।

সেই নিদাঘ দুপুরের কি কোনো মায়া আছে? বন্ধ দরজা-জানালার ওপর মোটা পর্দা, প্রায় অন্ধকার ঘরের মাথার ওপরে দুরন্ত বেগে ঘুরছিল সিলিং ফ্যানটা। খাটের বিছানায় ফুল্লরার পাশে শুয়ে চন্দনা অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। পাখা জোরে ঘুরছিল, তবু চন্দনার গলায় আর চিবুকে ঘাম চিকচিক করছিল। ঘামছিল ফুল্লরাও। ঘরের

ভিতর বাতাসেও উত্তাপ ছিল। বাইরেও একটা ঝোড়ো বাতাসের দাপাদাপি চলছিল। বন্ধ জানালায় মাঝে মাঝে তার ঝাপ্টা লাগছিল। যেন দুপুরের রাঢ়ের পাগলা বাতাস ঘরে ঢুকতে চাইছিল। পাশের ঘরে কমল কি করছে? ফুল্লরার মনে কেমন অকারণেই প্রশ্নটা জেগেছিল। আগের দিন দুপুরেও কমল, একই ঘরের মেঝেয় একটা মাদুর পেতে পাখার নিচে শুয়েছিল। কমলকে সেই প্রথম ফুল্লরা খালি গায়ে দেখেছিল। রাঢ়ের শুকনো উত্তাপেও আর্দ্রতা ছিল। কমলও ঘেমেছিল, আর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেই ঘামের স্রোত যেন কলকলিয়ে বহে।.

কিন্তু দ্বিতীয় দিন কমল এক ঘরে ছিল না। পাশেব ঘরে ছিল। কেন, কী কবেছিল কমল? ঘুমন্ত ঘর্মাক্ত চন্দনার পাশে নিজেৎ ঘর্মাক্ত অথচ জাগ্রত অবস্থায় জিজ্ঞাসাটা মনে এসেছিল। কমল কি কিছু পড়াশুনা করছিল? দারুণ দুপুরে, ও কি পাশের ঘরের জানালাগুলো খুলে ঘুমোচ্ছিল? কেনই বা জিজ্ঞাসাটা মনে এসেছিল? একান্তই একাকীত্বের জন্য, না কি কমলের অভাববোধ? অথবা নিতান্তই রাঢ়ের সেই দারুণ তাপদগ্ধ ঝটিকা-প্রমত্ত দুপুরের মায়া।

মনে জিজ্ঞাসার মুহূর্তেই, পাশের ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে গিয়েছিল। সামান্য শব্দেই ফুল্লরা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। আবছা অন্ধকারে, দরজার মাঝখানে, পায়জামা পরা খালি গা কমলকে দেখেই চিনতে পেরেছিল। ফুল্লরা মাথাটা তুলেছিল। কমলের নিচু স্বর শোনা গিয়েছিল, 'ঘুমোচ্ছিলে নাকি?'

ফুল্লবা উঠে বসেছিল। বুকের এলানো আঁচলটা টেনে দিয়ে, একবার ঘুমন্ত চন্দনাকে দেখে বলেছিল, 'না। কিছু বলছো?'

'চন্দনা ঘুমোচ্ছে?' কমল জিজ্ঞেস করেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'হ্যাঁ। কিছু বলছো?'

কমল যেন ভেবে পাচ্ছিল না, কি জবাব দেবে! কয়েক মুহূর্ত চুপ করে, অস্ফুট উচ্চারণে বলেছিল, 'না।' বলেই পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল।

ফুল্লরা বসে থাকতে পারেনি। কমল 'না' অথবা 'হ্যাঁ' কি বলেছিল, বুঝতে পারেনি, অথবা কি একটা অমোঘ শক্তি যেন ওকে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য। পাশের ঘরে ঠিক মাঝখানে, কমল ভূতগ্রস্তের মতো দাঁড়িয়েছিল। আবছা অন্ধকারের মধ্যেও ওরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিল। সেই আবছা অন্ধকারেও কমলের সারা গা ঘামে চকচক করছিল। ওর চুল লুটিয়ে পড়েছিল কপালে। মাথার ওপরে ঘুরন্ত পাখার বাতাসেও মাথার চুলগুলো উড়ছিল। ঘামে চকচকে শরীরের মতোই, ওর চোখ দুটোও যেন চকচক করছিল, অবাক অপ্রস্তুত চোখে ফুল্লরার দিকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, 'উঠে এলে ?'

ফুল্লরা জবাব দিয়েছিল, 'তুমি কী বলে এলে, বুঝতে পারলাম না।'

'দেখতে গেছলাম, তুমি ঘুমোচ্ছ কী না।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা কমলের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল, 'বললাম তো ঘুমোইনি। তুমি আজ ও ঘরে গেলে না কেন ? কি করছিলে এ ঘরে, একলা একলা ?'

'কি আবার করবো ?' কমল হেসে উঠেছিল। 'আমিও ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম।'

ফুল্লরার মনে হয়েছিল, কমল যেন স্বাভাবিক নেই। ওর কি জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছিল ? ফুল্লরা ওর গায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুমি কল্‌কল্‌ করে ঘামছো।'

'তোমার মুখেও ঘাম।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা শাড়ির আঁচল দিয়ে নিজের গলা আর মুখ মুছতে মুছতে বলেছিল, 'হ্যাঁ, ঘামছি তো। এত জোরে পাখা চালিয়েও ঘামছি। আমি ভেবেছিলাম এখানকার গরমে ঘাম হয় না। তুমি তো যেন চান করে উঠেছো। তোমাকে মুছিয়ে দেবো ?'

'মুছিয়ে দেবে ?' কমল এমনভাবে বলেছিল, যেন জিজ্ঞাসা না, স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে।

কমলের গায়ের দিকে তাকিয়ে ফুল্লরা যেন নিজের ভিতরে কেমন

একটা অস্থির-ব্যগ্রতা অনুভব করছিল, বলেছিল, 'হ্যাঁ মুছিয়ে দিই।' বলে ও আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'দেবো, আমার আঁচল দিয়ে?'

কমল কিছু না বলে, ফুল্লরার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। ফুল্লরা কমলের গায়ে আঁচল চেপে চেপে ঘাম মুছিয়ে দিয়েছিল, আর কমল যেন এলিয়ে পড়ছিল। ফুল্লরা বলেছিল, 'আরে, শক্ত হয়ে দাঁড়াও না।'

কমল তখন ফুল্লরার কাঁধে হাত দিয়ে চেপে ধরে দাঁড়িয়েছিল। ফুল্লরাও তখন কমলের ঘাড়ের পিছনে হাত দিয়ে চেপে ধরে বলেছিল, 'আমারই ভুল। ধরে না মোছালে, মোছানো যায় না। উহ্, তোমার নিশ্বাস কী গরম।'

'তোমারও।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'কিন্তু তোমার গা-টা ভারি ঠাণ্ডা।'

'তোমারও।' কমল আবার বলেছিল।

ফুল্লরা কমলের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। কমলের চোখে যেন হাজারটা অবাক জিজ্ঞাসা। ফুল্লরা বলেছিল, 'তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

'আমার?' কমল ঢোক গিলে, বোকার মতো হেসেছিল, বলেছিল, 'এ ঘরে একলা থাকতে থাকতে, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল।'

হঠাৎ ঢেউয়ের মতো, ফুল্লরার বুকের পাড়ে যেন একটা ঝাপটা লেগেছিল। ওর ঘাম মোছানো হাত থেমে গিয়েছিল। কমলের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। বিভ্রান্তি ওর মনে। বন্ধ ঘরের মধ্যেও বাইরের ঝোড়ো বাতাসের শব্দ ভেসে আসছিল। কমল আবার বলে উঠেছিল, যেন একটা ঘোরের মধ্যেই, 'আমি ভাবছিলাম, রূপাদের বাড়ির ছাদে বিমান তোমাকে কী করতে চেয়েছিল?'

ফুল্লরার বাঁ হাতটা কমলের ঘাড় থেকে খসে পড়েছিল, সন্দিগ্ধ স্খলিত স্বরে বলেছিল, 'কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছো? বিমান তো খুব জঘন্য। নোংরামি করতে চেয়েছিল, কিন্তু তুমি—।'

কমল তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারেনি। ফুল্লরা দু'পা সরে গিয়েছিল। আর ওর কাঁধ থেকে কমলের হাতটাও খসে পড়েছিল। ফুল্লরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন তুমি একথা জিজ্ঞেস করছো?'

'জানি নে।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি বোঝ না, বিমান কী করতে চেয়েছিল?'

'হ্যাঁ, একরকম বুঝতে পারি।' কমল ওর সেই ঘোর লাগা স্বরেই বলেছিল।

ফুল্লরা যেন সন্দেহ আর বিস্ময়ে মরে যাচ্ছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, 'তবু জিজ্ঞেস করছো কেন?'

'কী জানি।' কমল অকপট আবেগের স্বরে বলেছিল, 'ঘটনাটা আমার মনে পড়ছিল। আর তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল।'

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করেছিল, 'সেই ঘটনা মনে পড়ছিল বলে, আমাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল?'

'হ্যাঁ। তা ছাড়াও দেখতে ইচ্ছে করছিল।' কমল মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিল, সরে গিয়েছিল বিপরীত দিকে, বুক সেল্‌ফের কাছে, আর মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি আমার দিকে কেমন করে যেন তাকাচ্ছো। তুমি কি আমাকে বিমানের মতো ভাবছো নাকি?

ফুল্লরার বুকের পাড়ে আবার একটা ঢেউয়ের ঝাপ্‌টা লেগেছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই বিস্ময়কর, কমলকে ভীষণ দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। মনে মনে কেমন একটা অন্যায়বোধও জেগে উঠেছিল, বলেছিল, 'না না, তোমাকে বিমানের মতো ভাববো কেন?'

কমল কোনো জবাব দেয়নি। ফুল্লরা আস্তে আস্তে কমলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কমল তাকিয়েছিল ওর চোখের দিকে। অভিমানী আর ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছিল কমলকে। ছেলেমানুষ? ফুল্লরা নিজে কি খুব একটা বড় মানুষ ছিল নাকি? এখন ভাবলে হাসি পায়। কিন্তু মেয়েরা কোনো কোনো বিষয়ে, ছেলেদের থেকে সব

সময়েই বেশি অভিজ্ঞ। তথাপি কমলকে সেই সময়ে, পূর্বপল্লীর সেই দুপুরে দুর্বোধ্য লেগেছিল। বলেছিল, 'তোমাকে—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।' সেটা কি আমার দোষ?'

'আমিও বুঝতে পারছি না।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কাকে? আমাকে?'

কমল মাথা নেড়ে হেসে বলেছিল, 'না, আমাকে।'

ফুল্লরা আরও অবাক হয়েছিল। কমলের হাসি, কথা, সবই যেন ঠাট্টার মতো শুনিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'তার মানে কি?'

'আমিও জানি না, বিশ্বাস কর।' কমলের স্বরে যেন কাতরতা ফুটে উঠেছিল, 'আমিও জানি না, কেন আমার ওরকম মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি সত্যি বলছি।'

ফুল্লরার চোখে গভীর কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা। ও তাকিয়েছিল কমলের চোখের দিকে। কমল তখন অদ্ভুতভাবে মাথা নেড়ে হাসছিল, আর বারে বারে বলছিল, 'সত্যি, কী আশ্চর্য, কেন আমার ওরকম মনে হচ্ছিল, আমি বুঝতে পারছি না।'

ফুল্লরা কমলকে চিনতো, আর ও যে অকপট সরলভাবে কথাগুলো বলছিল, কোনো সন্দেহ নেই। ফুল্লরারও হাসি পেয়েছিল, বলেছিল, 'কমল, তোমাকে পাগলের মতো লাগছে।'

কমল হোহো করে হেসে উঠেছিল, বলেছিল, 'আমার নিজেরও তাই মনে হচ্ছে। আমি পাগল, পাগল ছাড়া কিছু নই।'

ফুল্লরা দেখেছিল, কমল আবার ঘামছে। ও নিজেও ঘামছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'আর এখনো কি আমাকে তোমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে?'

'করছে তো।' কমল অকপট আবেগে বলেছিল, 'এ ঘরে একলা একলা তোমার কথাই খালি আমার মনে পড়ছিল। তারপরে হঠাৎ সেই ছাদের কথা মনে পড়ে গেল, আর ভাবলাম, বিমান তোমাকে কী করতে চেয়েছিল? যেই মনে পড়লো, অমনি তোমাকে যেন আর না

দেখে থাকতে পারলাম না। আমি জানি না ফুল্লরা, সত্যি আমি জানি না, কেন আমার এরকম মনে হলো।'

ফুল্লরা কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারেনি, কমলের চোখের দিকেই তাকিয়েছিল, আর ওর বুকের পাড়ে যেন কমলের কথার সঙ্গে সঙ্গে বারে বারেই ঢেউয়ের ঝাপটা ছপাৎ ছপাৎ করে আছড়ে পড়ছিল। ওর রমণী চৈতন্যের কোন্ এক সুদূর অন্ধকারে যেন বিদ্যুৎ ঝলক খেলে গিয়েছিল। অনভিজ্ঞ নিষ্পাপ পুরুষের আবেগ, আগ্রহ, কৌতূহল ও আত্মপ্রকাশের এক আশ্চর্য বিপরীত রূপকে যেন ও কমলের মধ্যে ফুটে উঠতে দেখেছিল, আর ও যেন লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

'ফুল্লরা!' কমল ডেকেছিল।

ফুল্লরা চোখ তুলে কমলের দিকে তাকিয়েছিল। লজ্জা আর আবেগ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল ওর মনে। বলেছিল, 'তুমি খুব ঘামছো আবার, এসো মুছিয়ে দিই।'

'না, আমি তোমাকে মুছিয়ে দিই।' কমল ফুল্লরার আঁচলটা টেনে নিয়ে বলেছিল, 'তুমি আমার থেকে বেশি ঘামছো।' ও ফুল্লরার গলায় আর চিবুকে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিল।

ফুল্লরা হেসে উঠেছিল, আঁচলটা কেড়ে নিয়ে বলেছিল, 'না না, আমাকে মোছাতে হবে না। আমি তোমাকে মুছিয়ে দিই।' ও কমলের গায়ে আঁচল চেপে ধরেছিল।

কমল আবার আঁচলটা কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু ফুল্লরা আঁচলটা তৎক্ষাৎ কেড়ে নিয়েছিল। তারপর কেবলই আঁচল কাড়াকাড়ি আর হাসাহাসি, এবং হঠাৎ ফুল্লরা থেমে গিয়ে ডেকে উঠেছিল, 'কমল!'

কমল তাকিয়েছিল ফুল্লরার মুখের দিকে, চোখ রেখেছিল চোখে। কী ছিল ফুল্লরার চোখে? কমল হঠাৎ নিচু হয়ে, ফুল্লরার গালে ঠোঁট দিয়ে একবার হাল্‌কা স্পর্শ করেই, ছুটে গিয়েছিল দরজার কাছে। দ্রুত হাতে ছিটকিনি খুলতেই, যেন এক ঝলক চোখ-ধাঁধানো আগুন, দরজায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কমল ছিটকে বাইরে গিয়ে, দৌড়ে

চলে গিয়েছিল। ফুল্লরা স্থির থাকতে পারে নি। ও ছুটে দরজার কাছে গিয়েছিল। বাইরে চোখ ঝলসানো রোদ আর বাতাসের ঝাপটায় বাগানের গাছপালাগুলো যেন পাগলের মতো মাতামাতি করছিল। ফুল্লরার মনে হয়েছিল, বাতাসের তপ্ত হলকায় গা পুড়ে যাবে। ও ডেকেছিল, 'কমল'।

কমলকে দেখা যাচ্ছিল না ফুল্লরা গেটের দিকে তাকিয়েছিল। গেট বন্ধ ছিল। ফুল্লরা মাথা ঢাকা বারান্দার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে, বাগানের চারদিকে তাকি.য় দেখেছিল। বেশ কয়েক মুহূর্ত পরে, ঝাড়ালো কামিনী গাছের আড়ালে, কমলের পায়জামার অংশ দেখা গিয়েছিল। ফুল্লরা ছুটে গিয়েছিল সেখানে। কমল চমকিয়ে তাকিয়েছিল। ফুল্লরার চোখে তখন উদ্বেগ, ও নিজের মাথায় ঘোমটা ঢাকা দিয়ে বলেছিল, 'বেলুদির কথা ভুলে গেছ? এ হাওয়াটা একদম গায়ে লাগাতে নেই।'

'হ্যাঁ, এ বাতাসকে লু বলে।' কমল বলেছিল, 'একটুখানি লাগলে কী হবে?'

ফুল্লরা বলেছিল, 'একটুও না। শীগ্‌গির ঘরে চলো।'

'তুমি তো রাগ করেছো।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'হ্যাঁ করেছি। এখন ঘরে চলো।'

'না, তুমি রাগ করলে ঘরে যাবো কেমন করে?' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা কমলের চুলের ঝুঁটি মুঠি করে ধরেছিল, টানতে টানতে বলেছিল, 'এমনি করে।'

'উহু লাগছে, ফুল্লরার সঙ্গে চলতে চলতে কমল বলেছিল।

ফুল্লরা না থেমে, কমলের চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলেছিল, 'লাগুক।' একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে ফুল্লরা কমলের চুলের মুঠি ছেড়েছিল। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করেছিল। তারপরেই কমলের দিকে ফিরে হাত তুলে মারতে উদ্যত হয়েছিল।

কমল চকিতে ফুল্লরার হাতটা ধরে ফেলে বলেছিল, 'আরে, আর মেরো না। এখনো চুলে ব্যথা করছে।'

'করুক, তবু মারবো।' ফুল্লরা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলেছিল।

কমল ফুল্লরার হাত ছেড়ে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে বলেছিল, 'মারো তবে।'

'মারবোই তো।' ফুল্লরা কমলের ঘাড় চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল, 'কেন কেন কেন?'

কমল পাগলের মতে হেসে বলেছিল, 'একে মাব বলে নাকি?'

ফুল্লরা কমলের ঘাড় থেকে হাত তুলে, ওর গালে আস্তে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছিল, 'হয়েছে তো?'

'এইটুকু?' কমল বলেছিল, এবং আর একটি গাল পেতে দিয়েছিল।

ফুল্লবা মাববার জন্য হাত তুলেছিল, কিন্তু হঠাৎ সেই হাত দিয়ে কমলকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছিল, 'তুমি ভারি পাজী।' ওব স্বেদাক্ত বোতাম খোলা বুকে কমলের মুখটা চেপে ধরেছিল।

দরজাব বাইরে খট্ খট্ শব্দ শোনা গিয়েছিল, আর বেলুদির স্বর, 'দরজা খোল্‌রে, বাইরে আর দাঁড়াতে পারছি না।'

ফুল্লরা ছিটকে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল।…

সেই থেকে আট মাস, কমলের সঙ্গে জীবনটা প্রতিদিনের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু বিমানের সঙ্গে মেলামেশার পুনরাবৃত্তি না। কমলের কোনো ছদ্মবেশ ছিল না। কেবল কিছু আদায় করে নেবার দাবী ছিল না কমলের। কমল কি ওর প্রেমিক ছিল? প্রেমিকের সংজ্ঞা কী? ফুল্লরা জানে না। কমল ছিল প্রিয়তম সখা, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।

। পনেরো ॥

'আমরা দুটো স্টেট পার হয়ে এসেছি।' কমলের সেই অদ্ভুত নিচু স্বরে ফুল্লরা চমকিয়ে উঠলো। কমল আবার বললো, 'আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল আর বিহার ক্রস করে উড়িষ্যায় পড়েছি। তুমি সুবর্ণরেখার ব্রিজ দেখলে না। বাবিপদা ছাড়িয়ে আমরা এখন বালেশ্বরের পথে।'

ফুল্লরা যেন স্বপ্নের ঘোর থেকে জেগে উঠে বললো, 'আশ্চর্য, কিছু খেয়াল করিনি তো।'

'সেটাই লক্ষ্য করছিলাম।' কমলের কালো ঠুলিতে কৌতুকের ঝিলিক, 'দু' একবার চেষ্টা করে দেখেছি, তোমার ধ্যান ভাঙাতে পারিনি।'

'ধ্যান ?'

'নয় ? তোমাকে তোমার দিদির ছেলেও দু'একবার ডেকেছিল।'

ফুল্লরা বুবাইয়ের দিকে তাকালো। বুবাই এখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছে। দিদিও। ফুল্লরা মুখ ফেরাতেই কুমারদার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হলো। কুমারদার ঠোঁটের কোনে কি হাসি ? ও ডান দিকে একটু ঝুঁকে কুমারকে জিজ্ঞেস করলো, 'স্টপেজগুলোতে নামেননি ?'

কুমার বললো, 'না। বালেশ্বরে নেমে খাবো। তোমার নামবার ইচ্ছে ছিল নাকি ?'

ওদের কথা শুনে অমু ফিরে তাকালো, মুখে জিজ্ঞাসু হাসি। কুমার-দার কথায় ঠাট্টার বক্রতা। ফুল্লরা বললো, 'না, আমার নামবার দরকার

ছিল না।' ফিরে তাকালো কমলের দিকে, 'তোমার জন্যই এরকম হলো।'

'কী রকম?' কমলের স্বরে বিস্ময়।

ফুল্লরা বললো, 'কী সব বাজে বাজে কথা বলছিলে, আর সে-সব মনে পড়ছিল।'

কমলের কালো ঠুলিতে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো। হাসি ওর গোঁফ দাড়ির ভাঁজেও। বললো, 'সেই স্বেদাক্ত রমণীর—।'

'চুপ করো।' ফুল্লরা ঠোঁটে চোখে কৌতুকের ঝিলিক দিয়েই যেন প্রায় নিচু স্বরে ধমকিয়ে উঠলো।

'তুমি সবটাই ভুল বলেছো। আমার মনে হয়, তুমি কামু-র "দ্য সাইলেণ্ট ম্যান" থেকে কিছু বলতে চেয়েছিলে, তাই না?'

কমলের ঠুলির বাইরে, কপালের বাঁ দিকে মোটা ভুরু খোঁচা হয়ে উঠলো। হঠাৎ কিছু বললো না। কয়েক মুহূর্ত পরেই হেসে বললো, 'আশ্চর্য, ঠিক বলেছো তো।'

'কিন্তু সোয়েট ওম্যানের কথা কোথাও লেখা আছে বলে আমার মনে পড়ছে না।' ফুল্লরা বললো, 'ওটা বোধহয় তোমার মনগড়া।'

কমল সহজেই মেনে নিল, 'তা হতে পারে। কোন্ জায়গাটার কথা বলছি, তুমি বুঝতে পারছো?'

'বোধহয়।' ফুল্লরা বললো, 'যেখানে অতীতের স্বপ্ন, "গভীর স্বচ্ছ জল, উজ্জ্বল উষ্ণ রোদ, সুন্দরী যুবতী মেয়ে, সংযত কর্মচাঞ্চল্য, এ ছাড়া সুখ বলতে কিছু আর ছিল না দেশে।"...কিন্তু এ তো সেই ডস্টয়েভস্কির প্রতিধ্বনি, যৌবন চল্লিশেই শেষ, তারপরে যারা বেঁচে থাকতে চায়, তারা মূর্খ আর অপদার্থ। তুমি কি হতাশায় ভুগছো?'

'কেন বলো তো?'

'এসব কথা তোমার মনে আসছে কেন?'

'কারণ আমাদের সমস্ত জীবনটাই অস্বাভাবিক।'

'আদৌ নয়। কামু নিশ্চয়ই জানতেন, কিন্তু ডস্টয়েভস্কি জানতেন

না, আধুনিক বিজ্ঞান, মানুষকে দীর্ঘজীবী করবে, অতএব তাদের যৌবনও দীর্ঘস্থায়ী হবে।'

কমলের কালো ঠুলিতে আর দাড়ি গোঁফের ভাঁজে হাসির ঝিলিক ফুটলো, বললো, 'আধুনিককালের সঙ্গে এখানেই আমার গোলমাল লেগে যাচ্ছে। তোমাদের এই বিজ্ঞান আর টেকনোলজি, সবই আমার কাছে কানাগলি ছাড়া কিছু নয়।'

ফুল্লরা ঘাড় কাত করে, ওর স্বচ্ছ রঙীন কাঁচের ভিতরে চোখ জোড়া নিবিড় করে, প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'তোমার কথায় যেন রিএ্যাকশনারির সুর শুনতে পাচ্ছি।'

'কারণ রিএ্যাকশনারিদেব সম্পর্কে তোমার কোনো বাস্তব ধারণা নেই।' কমল বললো, 'সেইজন্যই ওরকম শুনতে পাচ্ছো। ধনতন্ত্রই বলো, আর সমাজতন্ত্রই বলো, সবখানে জেরণ্টোক্রাসির দৌরাত্ম্যে তো আর টেকা যাচ্ছে না।'

'জেরণ্টোক্রাসি মানে? বৃদ্ধতন্ত্র?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আজকাল নতুন করে ভাবছো দেখছি। কিন্তু সমাজতন্ত্রেও জেরণ্টোক্রাসির দৌরাত্ম্য?'

'আমি তো তাই দেখছি, সর্ব সমাজেই বিজ্ঞান আর টেকনোলজির দাসত্ব। আর আমাদের দেশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চৌদ্দসিকে। গোলামের গোলাম। সমাজ-চেতনার চেহারাটা কতো তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে, সেটা আমরা ধরতেই পারছি না। এই বিজ্ঞান আর টেকনোলজির দাসত্ব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে।' কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ যেন কমল সচকিত হয়ে ওর আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো। কিন্তু ওর মুখে এখন আর সেই কৌতুকের হাসি নেই। অথচ ও না থেমে আবার বললো, 'যে-কোনো অস্বাভাবিকতাই আজ আমাদের পথের অন্তরায়। সেইজন্যই কামু বা ডস্টয়েভস্কিকে আমার মোটেই অতীত স্বপ্নবিলাসী মনে হয় না।'

ফুল্লরা মনে মনে ভীষণ অবাক হচ্ছিল। মাথা ঝুঁকিয়ে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি মত বদলেছো?'

'কখনোই না।'

'পথ?'

'একটা নির্দিষ্ট মত থাকলে, পথ সব সময়েই বদলাতে পারে। কিন্তু বৈপ্লবিক শঠতারও একটা সীমা আছে।'

কমলের কথা শেষ হবার আগেই, ফুল্লরা ওর হাঁটুর ওপরে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল, 'আস্তে, অনেক কথা বলে ফেলছো।'

ঠিক এ সময়েই বাসের গতি কমে এলো, আর কণ্ডাক্টরের গলা শোনা গেল, 'বালেশ্বর। পৌনে এক ঘণ্টা স্টপেজ।'

বাসের ভিতরে নানা স্বরে নানা কথা শোনা গেল। যাত্রীরা সকলেই যেন কণ্ডাক্টরের এই ঘোষণাটির অপেক্ষা করছিল। কুমার বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'ফুলু, এবার বাঙালী মতে লাঞ্চটা সেরে নিতে হবে।'

বাস দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই, যাত্রীরা অনেকে উঠে দাঁড়ালো। তাদের নামবার ব্যস্ততার সঙ্গেই, বাইরে নানান স্বরে চিৎকার ভেসে এলো, 'গরম ভাত ডাল ভাজা তরকারি মুড়িঘণ্ট মাছের ঝোল।' কষা মাংস রুটি ভাত তরকারির চিৎকারও শোনা গেল।

'খুব খিদে পেয়েছে।' কমল বললো, 'পেট ভরে ভাত খেতে হবে।'

ফুল্লরার হাসি পেল, কিন্তু মনের কোথায় একটা কষ্টও বিঁধে গেল। সকাল বেলা কমলের কাঁচা পাঁউরুটি খাওয়ার ছবিটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। বললো, 'মনে হচ্ছে, অনেকদিন খাওনি।'

কমল হাসলো, 'খেয়েছি। অনেকটা তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মতো বলতে পারো। যখন সময় সুযোগ পাওয়া গেছে। অবিশ্যি সময় সুযোগের সঙ্গে খাবারটাও।' এ কথাগুলো নিচু গলায় বললো।

'ফুলু, আয়।' অমুর ডাক শোনা গেল।

ফুল্লরা ফিরে তাকাবার আগেই আবার সেই গান শোনা গেল, 'হায় এই কি দেখি, এই কি দেখি, আলো আদরি/প্যাট য্যান্ ওর উচা দেখি, দুধ জোড়া ভারি।'…

'ফের সুকুমার। ধমক শোনা গেল পিছনে, 'নো মোর ডেসক্রিপসান অফ্ আদরি। এখন পেটেয় ছুঁচোয় ডন মারছে। চল্ নাম তাড়াতাড়ি।'

ফুল্লরা পিছন ফিরে তাকালো। তিন জোড়া লাল করমচা চোখ। যেন ধস্তাধস্তি করে বাস থেকে নেমে গেল। তার মধ্যেই বোধহয় সুকুমারের গলা শোনা গেল, 'তের চৌদ্দর ব্যাপারটাতো তোরা—।'

'চুপ্!' স্পষ্টতই সুকুমারের মুখে হাত চাপা পড়ল।

কুমার বললো, 'ফুলু, সবাই নেমে গেছে, চলো তাড়াতাড়ি। ভালো হোটেলে আর জায়গা পাবো না।'

ফুল্লরা ব্যস্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে আশেপাশে দেখলো। বাসের মধ্যে দু'একজন ছাড়া যাত্রী নেই। এই অবসরেই ফুল্লরা বলে উঠলো, 'দিদি শোনো, এই যে কুমারদা, এ আমার বন্ধু। একসঙ্গে পড়েছি।' কমলকে দেখিয়ে বললো, আর কমলকে বললো 'আমার দিদি আর ভগ্নিপতি। ওর নাম বুবাই।'

বুবাইয়ের অভিমান এতক্ষণে কাটলো। কমলের দিকে তাকিয়ে পোকা খাওয়া দাঁত দেখিয়ে হাসলো। কমল আর দিদি ও কুমারের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করলো। কুমার তাড়া দিল, 'চলো নামি।'

কুমারের পিছনে পিছনেই সবাই নামলো। হোটেলগুলো থেকে এখনো ডাকাডাকি চলছে। ফুল্লরা লক্ষ্য করলো কমলকে। চোখের কালো ঠুলি না খুললেও, ও যে চারদিকে সাবধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশেপাশের চেহারা ও লোকজনকে দেখে নিচ্ছে, তা বোঝা যায়। কমলকে লক্ষ্য করতে করতেও, ফুল্লরা কুমার আর অনুর সঙ্গে যেতে যেতে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। কারণ কমল এক জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল। ফুল্লরাকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে, কমল ওদের দিকে এগিয়ে এলো, বললো,

'তোমরা কোথাও খেতে বসে যাও, আমি একটু ঘুরে-ফিরে, অন্য কোনো হোটেলে বসে খেয়ে নিচ্ছি।'

'কেন, তুমি তো আমাদের সঙ্গেই খেয়ে নিতে পারো।' ফুল্লরার মুখ থেকে উৎসুক ব্যাকুলতায় কথাটা বেরিয়ে এলেও তৎক্ষণাৎ ও কুমারের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে ফিরে তাকালো।

কুমার বললো, 'হ্যাঁ, অসুবিধের কী আছে?'

'একটু আছে।' কমল হেসে বললো, 'অকারণ একটা অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করাব কোনো মানে হয় না। মানে, আমার দিক থেকেই বলছি।'

কমলের শেষের কথাটা যে নিতান্তই সান্ত্বনা দেবার জন্য, ফুল্লরার বুঝতে অসুবিধে হলো না। আসলে অস্বস্তিটা ওর না, ফুল্লরাদের। ফুল্লরা ওর ব্যাগটা কাঁধেব কাছে টেনে তুলে, কুমারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তা হলে আমি আর ও একসঙ্গে অন্য কোথাও বসে খেয়ে নিচ্ছি। তোমরা একটা হোটেলে খেয়ে নাও।'

কুমার তাকালো অনুর দিকে। অনু কিছু বলবার আগেই, কমল বললো, 'কী দরকার? তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি ঠিক খেয়ে নেবো।'

'তা জানি!' ফুল্লরা হাসলো, 'একলা একলা খাবে কেন? দেখা যখন হয়েই গেল, চলো দুজনে একসঙ্গে খাই। অবিশ্যি তোমার যদি সত্যি সেরকম কোনো অসুবিধে না থাকে।'

কমল মুখ ফিরিয়ে, চোখের কালো ঠুলি থেকে বোধহয় একবার কুমার আব অনুব দিকে দেখলো, হাসলো, বললো, 'অসুবিধে আমার কিছু নেই।'

অনু কুমারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'যাক না।'

'আমি কি আপত্তি করেছি নাকি?' কুমার যেন খানিকটা অস্বস্তিতে হেসে উঠলো।

ফুল্লরা জানে, কুমারদার কাছে ব্যাপারটা মোটেই স্বস্তিদায়ক না। ও কুমারকে কিছুটা চেনে। দিদি অবিশ্যি কিছু না ভেবে, ওর মতো

করেই কথাটা বলেছে। কিন্তু ফুল্লরা নিজেকেই বোধহয় সব থেকে কম জানে। সকালের কলকাতার ফুল্লরা এখন আর নেই। একটি মেয়ের মধ্যে কতো দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে, ও তারই একটা মস্ত উদাহরণ। ও নিজেও জানে না, এখন কমলকে নিয়ে ও কতো ব্যস্ত, উৎসুক, ব্যাকুল, এবং নিজের দিদি ভগ্নিপতি আর তাদের ছেলের কাছ থেকে কতোটা সরে গিয়েছে। ওর ছুটি আর বেড়ানোর সমস্ত খুশি আর উত্তেজনা এখন একটি মাত্র মানুষে কেন্দ্রীভূত। এখন জানালার ধারে বসার খুনসুটি করার মন নেই। ও খুব অনায়াসেই কমলের সঙ্গে পা বাড়িয়ে, সকলের দিকে হাত তুলে বললো, 'তা হলে তোমরা এক-জায়গায় বসে পড়, আমিও খেয়ে আসছি।'

বুবাই ঠিক তখনই, ওর ঠোঁট ফুলিয়ে, ফুল্লরাকে কড়ে আঙুল দেখালো। অর্থাৎ আবার আড়ি।

॥ ষোল ॥

কমল একটা সিগারেট ধরালো। ও যে পরিতৃপ্তি করে খেয়েছে, ফুল্লরা তা দেখেই বুঝতে পেরেছে। বাস স্টপের ঘিঞ্জি পরিবেশটা ছাড়িয়ে, কমল বেছে নিয়েছিল, বাস-লরি-ট্রাক চালকদের প্রকৃত পান্থ-শালা বলতে যা বোঝায়, সে-রকম একটি খাবার জায়গা। বালেশ্বরের মতো জায়গায়, বড় রাস্তার ওপরে নির্জনতা বলতে কোথাও কিছু নেই। তবু লরিচালকদের লম্বা খড়ের চালের ঘর, অনেকগুলো খাটিয়া, আর রুটি-তরকা-মাংসের গন্ধে পরিবেশটা অনেক ভালো।

ফুল্লরা প্রথমে একটু অস্বস্তিবোধ করলেও, কাটিয়ে উঠেছিল। খাবে কী না, ঠিক করতে পারেনি। কিন্তু ভাতের বদলে, কমলকে রুটি পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা আর তরকা দিয়ে খেতে দেখে, ওর খিদেও যেন রসনা আপ্লুত করে জেগে উঠেছিল। খাবার পাত্র আর জলের গেলাস দেখে যে-টুকু বিঘ্নি লেগেছিল, ধোয়া পদ্মপাতা আর মাটির ভাঁড় দেখে সেটাও কেটে গিয়েছিল। কমল ভাত খাবে বলেছিল, কিন্তু পেট ভরে খেয়ে নিল রুটি।

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করলো, 'ভাত খাবে না?'

'না, রুটিতেই পেট ভরে গেছে।' কমল বললো, 'আধ-ডজন রুটির পরে আর ভাত চলে না। তুমি তো এখনো খাবার নিলেই না।'

ফুল্লরা হেসে বললো, 'তোমার খাওয়াটা দেখলাম। এবার আমি খাবো। তবে আমিও রুটিই খাবো।'

'এরকম তরকা মাংস দিয়ে ভাত খাওয়া যায় না।' কমল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'এবার এক গেলাস চা খেতে হবে।'

ফুল্লরা অবাক হেসে বললো, 'এই গরমে আর দুপুরে?'

'গরমে, গরমই তো ভালো।' কমলের চোখে তৃপ্তির হাসি। এখন ওর চোখে সেই মুখোশের মতো ঠুলিটা নেই। বললো, 'তোমার জন্য কী খাবার দিতে বলবো?'

ফুল্লরা বললো, 'আমি বলছি।'

বড ঘরটার এলোমেলো খাটিয়ায় বসে আরো দু' তিনজন ড্রাইভার ক্লিনার খাচ্ছিল। মুরগী আর বেড়াল পাশাপাশিই ঘুরে বেড়াচ্ছে খাটিয়ার নিচে। ঘবের একপাশে, উঁচু আব চওড়া উনুনের ধারে রান্নায় রত একজন মাঝবয়সী লোকেব দিকে হাত তুলে ফুল্লরা ডাকলো, 'এই যে ভাই, এখানে একটা রুটি আব মাংস দিন। কাঁচা পেঁয়াজ আর লংকা দেবেন।'

লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'আভি লে আঁতে।'

কমল ঠোঁট টিপে হেসে বললো, 'একদিক থেকে, তুমি সঙ্গে থাকায় ভালোই হলো।'

'কী রকম?' ফুল্লরা জিজ্ঞেস করলো।

কমল বললো, 'ছদ্মবেশটা ভালোই হলো। একটি ছেলে আর মেয়ে জোড় বেঁধে ঘুরলে, এক শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই। কিন্তু আমাকে যারা খুঁজছে, তাদের দৃষ্টি হঠাৎ আমাদের ওপর পড়বে না। বিশেষ করে তোমার মতো একজন শহুরে রূপসী আধুনিকা—।'

'একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।' ফুল্লরা বাধা দিয়ে বললো।

'মোটেই নয়।' কমল বললো, 'ধরো আমি যদি বাসের সেই ছেলেগুলোর বন্ধু হতাম, তা হলে তোমাকে দেখে নির্ঘাৎ আওয়াজ দিতাম।'

ফুল্লরা পুরনো দিনের মতোই কমলকে মারবার জন্য হাত তুললো। কমল তাড়াতাড়ি মাথা সরিয়ে হেসে উঠলো। বললো, 'সত্যি, ভেবো না যে এ ক'বছরে চোখের দৃষ্টিও নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি দেখতে আগের

থেকে অনেক সুন্দর হয়েছো। অবিশ্যি তুমি বরাবরই তাই ছিলে, তবু যেন— ।'

'তোমার মাথা।' ফুল্লরা বললো, 'আমি এখন বুড়িয়ে যাচ্ছি। জানো না, মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি? অবিশ্যি তোমারই কথা, পুরুষেরা চল্লিশে মূর্খ আর অপদার্থ।'

কমল বললো, 'আমি বলেছি চল্লিশের পরেও যদি পুরুষরা নিজেদের যুবক মনে করতে চায়, তবে ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায়, তথাকথিত বিজ্ঞানের কল্যাণে অবিশ্যি এখন বাবারাও ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিতে চাইছে—চেহারায় পোশাকে বৃত্তিতে উপার্জনে, এই যুগের যা অস্বাভাবিকতার লক্ষণ। ধ্বংসেরই সংকেত এসব। এই সব বিজ্ঞান, টেকনোলজি— ।'

ফুল্লরার সামনে একটি ছেলে ধোয়া পদ্মপাতা পেতে দিল, আর এক ভাঁড় জল। সেই মাঝবয়সী লোকটি রুটি আর মাংস বেড়ে দিল। একপাশে দিল দুটি কাঁচা লংকা আর একটি আস্ত পেঁয়াজ। ফুল্লরা বললো, 'তা হলেও মেয়ে হিসেবে আমি বুড়িয়ে গেছি। আমার পঁচিশ হলো।'

কমল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দেখা গেল একটা জীপ আস্তে আস্তে ঝোপড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। পুলিসের জীপ। ডাইনে বসে একজন উনিফর্ম পরা ইনস্পেক্টর। ইনস্পেক্টরের কোমরে রিভলভার। চোখে সান গ্লাস। বাঁয়ে উনিফর্ম পরা ড্রাইভার।

ফুল্লরা খাবারে হাত দিতে গিয়ে, চমকিয়ে কমলের দিকে তাকালো।

কমলের চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, কিন্তু ও মুখটা পাশ ফেরালো। সিগারেটটা ফেলে দিল নিচে, বাঁ হাত নামিয়ে নিল পাঞ্জাবির তলায়। প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'খাও, খেতে থাকো।'

ফুল্লরার মনে হলো, অসম্ভব। তবু ও রুটিতে হাত দিল। জীপের ড্রাইভার নেমে এগিয়ে এসে, এদিক ওদিক দেখে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলো, 'দিবাকর মিস্তিরি কোথায়?'

মাঝবয়সী সেই লোকটিই জবাব দিল, 'এদিকে আসেনি।'

ড্রাইভার বললো, 'গ্যারেজ থেকে বললো, এখানে খেতে এসেছে?'

মাঝবয়সী লোকটি হেসে বললো, 'দেখুন গিয়ে, সরাব খেয়ে কোথায় পড়ে আছে।'

ফুল্লরার মনে হলো, জীপে বসে ইনস্পেক্টর কমলকেই দেখছে। ও আড়চোখে কমলকে দেখলো। কমলের মুখ শক্ত, ডান হাতে ওর নিজের চোখের ঠুলিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। ড্রাইভার কমল আর ফুল্লরাকে একবার দেখে, পিছন ফিরে ইনস্পেক্টরের দিকে তাকালো। তারপর বাকিদের দিকে, যারা খাটিয়ায় বসে, কোলে এনামেলের থালা নিয়ে খাচ্ছিল।

ইনস্পেক্টর নেমে এলো। কালো বেঁটেখাটো শক্ত চেহারা, দর্পিত ভঙ্গিতে ঝোপাড়ুর সামনে এগিয়ে এসে, মাঝবয়সী লোকটির দিকে তাকালো, জিজ্ঞেস করলো, 'দিবাকরকে এখন কোথায় পাওয়া যেতে পারে?'

ফুল্লরার বুকে দামামা বাজছিলই। একটা টাউস পুলিস ভ্যান জীপের পিছনে এসে দাঁড়াতেই, ওর হাত আপনা থেকেই এমন নড়ে উঠলো, জলের ভাঁড়টা বেঞ্চির মতো সরু টেবিল থেকে নিচে পড়ে গেল। সেদিকে ওর খেয়ালই নেই, যে ভাঁড়ের জল চলকে পড়লো ওর হাঁটুর কাছে শাড়িতে। ও কমলের দিকে তাকালো, মুখ রক্ত শূন্য।

কমল তাড়াতাড়ি ওর দিকে ফিরে নিচু স্বরে বললো, 'এত আপসেট হচ্ছো কেন? খেতে থাকো না?' ও নিজেই নিচু হয়ে ফুল্লরার শাড়ির জল ঝেড়ে দিল।

ফুল্লরা কমলের বাঁ দিকে কট্ করে একটা শব্দ শুনতে পেল। কমল মুখ তুলে স্বাভাবিক ভাবে হাসলো। অন্তত চেষ্টা করলো।

মাঝবয়সী লোকটি রাস্তার ধারে এগিয়ে গিয়ে ইনস্পেক্টরকে বললো, 'দিবাকরের কোনো ঠিক নেই সার। একবার সরাব খেলে, ও কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কেউ বলতে পারে না।'

ভ্যানের ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে, ইনস্পেক্টরের উদ্দেশ্যে বললো, 'দিবাকরের দেখা পেলেন স্যার ?'

ইনস্পেক্টর পিছন ফিরে বিরক্ত স্বরে জবাব দিল, 'না।'

জীপের ড্রাইভার বলে উঠলো, 'সব ভালো মোটর মিস্তিরিগুলোই মাতাল।'

ভ্যানের ড্রাইভার বললো, 'জীপটা কি একেবারেই চলছে না ?'

জীপের ড্রাইভার জবাব দিল, 'চলছে। তবে মনে হচ্ছে, এ. সি. পাম্পে কোনো গোলমাল হচ্ছে, গাড়ি টানছে না। তার মানে তেল আসছে না, আর বারে বারে ব্যাক ফায়ার আওয়াজ দিচ্ছে।'

ইনস্পেক্টর ঝোপড়ির ভিতরে সকলের মুখের দিকেই চোখ বুলিয়ে দেখলো। কমল আর ফুল্লরাকেও দেখলো। মাঝবয়সী লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার এখানে যারা রয়েছে, তাদের কেউ মেকানিক আছে ? একবার দেখতে পারবে ?'

মাঝবয়সী লোকটি কমল আর ফুল্লরা ছাড়া বাকী কয়েকজনকে দেখে নিয়ে বললো, 'এরা সব ভিন্‌দেশী ড্রাইভার আছে। খাওয়া হলেই গাড়ি নিয়ে চলে যাবে।'

ভ্যানের ড্রাইভার ইনস্পেক্টরকে বললো, 'সামনের পেট্রোল পাম্পে আসুন স্যার, আমি দেখছি।'

ভ্যানটা তার এঞ্জিনের স্টার্ট থামায়নি। দু' এক মিটার ব্যাক করে সোজা সামনে এগিয়ে গেল। ইনস্পেক্টর বেশ রোখা স্বরে মাঝবয়সী লোকটিকে বললো, 'দিবাকর তোমার এখানে এলেই থানায় যেতে বলবে।'

'বলবো স্যার।' লোকটি জবাব দিল।

ইনস্পেক্টর এবার যেন স্পষ্টতই তার সান গ্লাসের ভিতর থেকে ফুল্লরাকে লক্ষ্য করে, পিছন ফিরে চলে গেল। উঠলো গিয়ে জীপে। ড্রাইভার ঘুরে বাঁ দিকে উঠে, এঞ্জিন স্টার্ট করলো। জীপটা যেন খরগোসের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে কয়েক মিটার গিয়ে, একটা ব্যাক

ফায়ারের শব্দ করলো, তারপর আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

'এবার দয়া করে খাও।' কমল বললো, 'তুমি প্রায় একটা সিন ক্রিয়েট করে ফেলেছিলে।'

ঝোপড়ির অন্যান্য লোকগুলো তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। পুলিসের আচরণের বিরুদ্ধেই খানিকটা হাসি ঠাট্টা মেশানো কথাবার্তা। ফুল্লরা রুটি ছিঁড়ে মুখে দিতে গিয়ে বললো, 'ভীষণ ভয় পেয়ে গেছলাম।'

'ভয় পেয়ে লাভ কী?' কমল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আব দেশলাই বের করে বললো, 'বিপদ তো যখন তখনই আসতে পাবে। তবে এ ব্যাপারটা নিতান্তই কাকতালীয়, আসলে ওরা মিস্তিরিকে খুঁজতেই এসেছিল।'

ফুল্লরা অন্যান্যদের একবার দেখে, মুখের খাবার গিলে বললো, 'তুমি ভয় পাওনি?'

'না। তবে আমি যে-কোনো পরিস্থিতিব মোকাবিলা করতেই প্রস্তুত আছি।' কমল ঠোঁটে সিগারেট চেপে ধবে বললো, 'ভয় পেলে আর প্রস্তুত হওয়া যায় না। তবে আমার একটাই ভরসা। ওয়েস্টবেঙ্গল আর বিহার পেরিয়ে এসেছি। বিপদের সম্ভাবনা ওদিকেই বেশি ছিল।' ও দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালো।

ফুল্লরার মুখে আস্তে আস্তে ওর স্বাভাবিক রঙ ফিরে এলো। মুখের ভিতর রুটি আর মাংসের স্বাদটাও বেশ উপভোগ করছে। নিচু স্বরে বললো, 'তোমার পাঞ্জাবি ঢাকা ট্রাউজারের বাঁ দিকের পকেটে কিছু আছে না?'

'ও-সব কথা জিজ্ঞেস করতে নেই।' কমল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ঈষৎ হেসে বললো, 'অনুমান যখন করতে পেরেছো, তখন ঠিকই আছে।'

ফুল্লরা বললো, 'তুমি আমার হাঁটুর কাছে জল মুছিয়ে দেবার সময় একটা কট্ করে শব্দ হয়েছিল।'

'তা হয়েছিল। ওটা লক্ করা ছিল, জল মোছার ফাঁকে আনলক্ করে নিয়েছিলাম।' কমল বললো, আশেপাশে একবার তাকিয়ে দেখলো, 'যদি হঠাৎ দরকারে লেগে যায়।'

ফুল্লরার চোখে একটা উদ্বিগ্ন অবাক অনুসন্ধিৎসা, 'যদি কোথাও কিছু ঘটেই যায়, একলা একটা অস্ত্র দিয়ে, অনেকের সঙ্গে তুমি পেরে উঠবে কেমন করে?'

'এরকম ক্ষেত্রে ডিফেন্স আর স্কেপটাই আসল কথা।' কমল বললে, 'আমি তো আর লড়াই করতে বেরোইনি। আসলে আমি তো আবার ওয়েস্টবেঙ্গলেই ফিরবো।'

ফুল্লরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তার জন্য পুরী ঘুরে?'

'হ্যাঁ। কলকাতা থেকে ওয়েস্টবেঙ্গলের কোনো গ্রামে যেতে হলে সোজাসুজি যাবার রাস্তা আমার নেই।' কমল হাসলো, 'তুমি আর একটা রুটি খাও।'

মাঝবয়সী লোকটি একটা মস্ত বড় কাঁচের গেলাসের গলা ভরতি ধূমায়িত দুধেল চা কমলের সামনে রাখলো।

ফুল্লরা বললো, 'রক্ষে করো, একটা রুটিতেই আমার পেট ভরে গেছে।'

মাঝবয়সী লোকটা বোধহয় ফুল্লরার বাঙলা কথা বুঝতে পারলো, হিন্দীতে বললো. 'তো গরম ভাত নিন না দিদিমণি। মাছের ঝোল আছে।

ফুল্লরা মাথা নেড়ে বললো, 'না না, আমি আর কিছু খাবো না।'

মাঝবয়সী লোকটা সরে যেতে, কমল বললো, 'ভয়েই তোমার পেট ভরে গেছে। দিদি জামাইবাবুর কাছে থাকলে, পেট ভরে খেতে পারতে।'

'ভুল।' ফুল্লরা জোর দিয়ে বললো, 'দিদিদের সঙ্গে খেতে বসে, পুলিসের ওই জীপ আর ভ্যান দেখলে, আমি খেতেই পারতাম না। কেবলই মনে হতো, তোমার একটা কিছু বিপদ ঘটতে চলেছে।'

কমল ওর সেই ঝকঝকে চোখ তুলে ফুল্লরার মুখের দিকে তাকালো। ওর বাঁ ভুরু একটু কুঁচকে উঠেছে, চোখে জিজ্ঞাসা। ফুল্লরার মুখে ছ'টা লাগলো, বললো, 'জানি, তুমি কী ভাবছো। ভাবছো, এতকাল দেখাসাক্ষাৎ নেই, তুমি মরে গেছ কী বেঁচে আছো, তার জন্য কিছু যায় আসেনি, আর হঠাৎ আজ পথে দেখা হয়ে যেতেই এতোটা এ্যাংজাইটি—বেশ একটু বাড়াবাড়ি লাগছে, তাই না?'

কমল হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলো না, ঠোঁটে একটু হাসি ফুটে উঠলো। ফুল্লরা যেন কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠলো, 'জানি জানি, বুঝিও। অবিশ্যি এরকম ভাবাই স্বাভাবিক, আর সত্যিই, আমি তো আমার জীবন থেকে তোমাকে একরকম বাদ দিয়েই রেখেছিলাম। তুমি এমনভাবেই সরে গেছলে—যেন আমি বা আমরা অনেকেই তোমার জীবনে আদৌ কোনোকালে ছিলামই না।'

'সেটা তো অস্বীকার করছি না—।' কমল শান্তভাবে কথাটা বলতে গেল।

ফুল্লরা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, 'না না, ভেবো না, তার জন্য তোমাকে কোনো দোষ দিচ্ছি। কিন্তু তুমি একটা কথা হয়তো বুঝবে না কমল—।'

'স্‌স্‌স্‌—।' কমল শব্দ করে উঠলো।

ফুল্লরাও মুহূর্তেই ঠোঁট টিপলো। কিন্তু ওর মুখে রক্তের ছটা, চোখ ছলছলিয়ে উঠেছে। বললো, 'সরি খেয়াল ছিল না। কিন্তু আমি হয়তো তোমাকে বোঝাতে পারবো না,—আমি একটা সামান্য মেয়ে, কয়েক বছর পরে তোমাকে আচমকা পেয়ে—মানে দেখা পেয়ে, আমি যেন সব ভুলে গেছি।'

ফুল্লরার কথার মাঝখানেই, কমলের একটা হাত ফুল্লরার টেবিলে রাখা বাঁ হাতের ওপর এসে পড়লো, একটু চাপ দিল, বললো, 'ফুল্লরা তোমার মনের কথা হয়তো খানিকটা বুঝতে পারছি। তোমার দেখা পেয়ে, আমার মনেও কী কিছু হয়নি ভেবেছো? আমি তো অমানুষ

হয়ে যাইনি, বরং মানুষ হিসাবে পারফেকশনের কথাই সব সময় মনে হয়, যদিও জানি না, বুঝে উঠতে পারি না, হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ এ পারফেক্ট ম্যান।'

ফুল্লরা তাকালো কমলের চোখের দিকে। ওর চোখের হাসিতে বিষণ্ণতার ম্লানতা। কিন্তু ফুল্লরার চোখের কোণে বড় বড় ফোঁটায় জল জমে উঠেছে। গালে বেয়ে পড়বার মুহূর্তেই ও যেন টের পেল, আর তাড়াতাড়ি আঁচল তুলে, চোখের দুই কোণ চেপে চেপে মুছে নিল। স্খলিত স্বরে বললো, 'সরি।'

'এভাবে সরি বলো না।' কমল বললো, 'ও সব সরি-টরি শুনতে আমার ভালো লাগে না। ভেবো না, আমি অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছি, যাদের বুক টাটায় না, চোখে জল আসে না, মন বলে কোনো পদার্থ নেই। আমার ধারণায় আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতো বুদ্ধি যুক্তি দিয়ে কাজ হয়েছে, তার অনেকখানিই পণ্ড হয়েছে হৃদয়হীনতার জন্য। আমার কষ্ট হলে, আমি সরি-টরি বলতে পারি না।'

ফুল্লরার দুই চোখে যেন অপরিসীম বিস্ময় ও মুগ্ধতা, প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'আমি যেন তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আর সেইজন্যই তখন বাসে জিজ্ঞেস করছিলে, আমি মত বদলেছি কী না?' কমল হাসলো, 'তোমার মনের একটা ছকে আমি বাঁধা পড়ে আছি। দোষ দেবো না তোমাকে, কিন্তু সত্যি বলছি ছকটা বড় খারাপ ব্যাপার। ছক থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই। যে-নিজেকে মুক্ত ভাবতে পারে না, সে অন্যদের মুক্ত করবে কী করে? কোনো কিছুতেই ছকের থেকে খারাপ কিছু নেই, তা যদি বিপ্লবও হয়। আর বিপ্লবই বা কী? তার কোনো শেষ নেই, অতএব কোনো ছকও নেই। আমাদের সঙ্গে যদি তুমি মিশতে, দেখতে আমরা রেভ্যলুশনারি থেকে রিবেলিয়ানই বেশি। বিদ্রোহ যুগে যুগে—মানে, বিপ্লব। কোনো ইজমেই বোধহয় এর কোনো পরিসমাপ্তি নেই। একমাত্র জেরন্টোক্রাসিই নিজেদের ক্ষমতায় তৃপ্ত

থাকতে চায়। বিপ্লবীদের মধ্যেও বৃদ্ধতান্ত্রিকের তো অভাব নেই। আমাদের দেশে তো নেই-ই। ফলে, আমাদের দলের অধিকাংশ শহরের ছেলেরাই অনেকটা ড্রিফটারের মতো। তাদের গতি আছে, অথচ যেন সঠিক গন্তব্য নেই, কারোর প্রভুত্ব মানতে পারে না, বর্তমান সমাজের নীতি মানের কোনো মূল্য তো আদৌ নেই তাদের কাছে। হয়তো এটা বিশেষ করে আমাদের বেলায় এমন করে ঘটতো না, যদি না আমাদের একটা বিরাট অংশের মার্কসিজম্ থেকে বিচ্ছেদ ঘটতো। সব তাত্ত্বিকেরা মিলে মার্কসিজমকে এমন একটা তরল পদার্থের মতো করে তুলেছে, যার কোনো ল্যাজা মাথা নেই। এখন পৃথিবী জুড়ে মার্কসীয় তত্ত্বেরই সংকটের কাল চলেছে, ফলে আমরা এলোমেলো ছুটে মরছি। অথচ আমাদের কাছে দাবী করা হচ্ছে জিজ্ঞাসাহীন ত্যাগ আর উৎসর্গ আর খতম—।'

'ফুলু।' রাস্তার ওপর থেকে কুমারের ডাক ভেসে এলো।

ফুল্লরা আর কমল, দুজনেই মুখ তুলে দেখলো, কুমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তার চোখে মুখে ব্যস্ততা ও উদ্বেগ। সে আবার বললো, 'বাস ছেড়ে দিচ্ছে। আমি তো তোমাদের খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। তাড়াতাড়ি এসো।'

কমল তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললো, 'আমাদের কতো হয়েছে ভাই?'

ফুল্লরা কমলের কথার তত্ত্ব তথ্য কিছুই সম্যক বুঝে উঠতে পারছিল না, তবু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যাচ্ছিল। কমলকে পকেটে হাত দিয়ে দামের কথা জিজ্ঞেস করতেই, ও তাড়াতাড়ি ব্যাগের মুখ খুলে বললো, 'উহুঁ, তুমি নয়, ওটা আমি দেবো। আজ তুমি আমার গেস্ট।' বলে ব্যাগ থেকে একটি দশ টাকার নোট টেনে বের করলো।

কমল হেসে বললো, 'আপত্তি করবো না। আমার থেকে তুমি এখন সলভেন্ট।'

কুমার বললো, 'তোমরা এসো, আমি বাসটাকে দাঁড়াতে বলছি।' বলে সে চলে গেল।

মাঝবয়সী লোকটি ফুল্লরার হাত থেকে দশ টাকার নোট নিয়ে, ব্যস্তভাবে খুচরো মিটিয়ে দিল। ঝোপড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তে, ফুল্লরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, 'শ্যামল আর শিবতোষদা এখন কোথায়?'

'আস্তে!' কমল নিচু স্বরে প্রায় ধমক দিয়ে উঠলো, 'এত সহজে নামগুলো বলছো কী করে?'

ফুল্লরার মুখে বিব্রত অপরাধের হাসি ফুটলো, 'ওহ্ সরি।'

'সরি।' কমল যেন ঈষৎ ব্যঙ্গ করে হাসলো, বাইরে বেরিয়ে এলো, 'চলো, বাসে বসে বলবো। তবে এটুকু জেনে রাখো, শিবতোষদা এখন জেলে। শ্যামল কলকাতায় আছে, আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, অবিশ্যি আমাদের মত আর পথ নিয়েই।'

বাসের ড্রাইভার তখন এঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে, পাগলা ঘোড়ার মতো হর্ন বাজিয়ে চলেছে।

॥ সতেরো ॥

কমল আর ফুল্লরা বাসে উঠতেই, বিরক্ত কণ্ডাক্টর জোরে ঘন্টি বাজিয়ে দিল। বাস একটা ঝাঁকুনি দিয়ে খ্যাপা ঘোড়ার মতোই ছুটলো। আর তখনই সেই গান আবার ভেসে এলো, 'আবিয়াতো ছেমড়ি তুই আলো আর্দরি/পোয়াতি মাগীর !'

'নো, নো মোর আদরি ভালগার ফোক্ সঙ্।' কেউ নিশ্চয় স্বকুমারের মুখে হাত চাপা দিল। অনেকেই পিছনের দিকে তাকালো। ফুল্লরা একবার কুমারের গম্ভীর মুখে ম্যাগাজিন পড়া দেখলো। দিদির সঙ্গে কিঞ্চিৎ হাসি বিনিময়। আর বুবাইয়ের সেই কড়ে আঙুল দেখানো। বাপ্-কা-বেটা। কিন্তু ফুল্লরার স্মৃতি জুড়ে তখন কয়েক বছর আগের ঘটনাগুলো ছবির মতো ভেসে যাচ্ছে।

বেলুদি আর শিবতোষদার রহস্যময় ছাড়াছাড়ির কথা প্রথমে ফুল্লরা বুঝতে পারেনি। ওকে জানিয়েছিল কমল। শিবতোষদা যথার্থভাবে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য না হলেও, বরাবরই কমিউনিস্ট মাইণ্ডেড ছিলেন। মার্কসিস্ট তাত্ত্বিক হিসাবে, তিনি প্রায় একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। বেলুদির গভীর ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে শিবতোষদার মার্কসীয় তত্ত্বের যথেষ্ট প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের কখনো অসুখী দম্পতি মনে হয়নি। নকশাল আন্দোলনই প্রথম, দু'জনের মধ্যে চিন্তাগত প্রভেদটাকে এতোই দুস্তর করে তুলেছিল, তাঁদের একসঙ্গে বাস করাও আর সম্ভব ছিল না। শিবতোষদা যখন থেকে নকশালদের সঙ্গে হাত মেলালেন, তখন থেকেই বেলুদির শান্তিনিকেতনে চাকরির আয়োজন। দুজনের ছাড়াছাড়ি পাকাপাকি হতে দেরি হয়নি।

শিবতোষদার সঙ্গে শ্যামলের থেকে যাওয়ার রহস্যও ছিল সেখানেই। সে ছিল মনেপ্রাণে শিবতোষদাপন্থি, ঘোরতর বিরোধ ছিল দিদির সঙ্গে। সেই কারণেই ও কলকাতায় শিবতোষদার সঙ্গে থেকে

গিয়েছিল, আর চন্দনাকে নিয়ে বেলুদি চলে গিয়েছিলেন শান্তি-নিকেতনে। ফুল্লরা এসব জেনেছিল কমলের কাছ থেকে, কিন্তু বুঝতে পারেনি, কমলও আস্তে আস্তে শিবতোষদার কাছে রাজনৈতিক দীক্ষা নিচ্ছিল। তবে কমলের মধ্যে একটা পরিবর্তন যে ঘটছিল, সেটা ওর চোখ এড়ায়নি। ফুল্লরা প্রথমে ধরে নিয়েছিল, কমল ওর কাছ থেকে সরে যেতে চায়। পরে ভেবেছিল, কমলের সঙ্গে বাড়ির কোনো গোলমাল চলছে। তারপরে কমল নিজেই বলেছিল, জীবনকে দেখার চোখ ওর বদলিয়ে গিয়েছে। নিজের জীবনযাপন ওর কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল, স্ব-বিরোধিতায় ভুগছিল, যার থেকে একমাত্র মুক্তির পথ ছিল, সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠন করা। ফুল্লরার কাছ থেকে ও খুব সহজেই বিদায় নিয়েছিল, তবু একবার জানতে চেয়েছিল, ফুল্লরা ব্যাপারটাকে কী ভাবে নিচ্ছে?

ফুল্লরার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল আকস্মিক এবং অতি নাটকীয়, আর একটা আবছা অপরিচয়ের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা। উত্তর-বঙ্গে ওদের পরিবারে রাজনীতির কোনো ছোঁয়া ছিল না, তা বলা যায় না। কিন্তু তা ছিল গান্ধীবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ও নিজে কখনো রাজনীতি করার কথা ভাবেনি। ভাবেনি, কমলও কখনো হঠাৎ পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক দলে দীক্ষা নিতে পারে। ও কমলকে জবাব দিয়েছিল, 'আমি এ বিষয়ে কিছুই ভাবিনি। তা ছাড়া, তুমি তো তোমার কথা কখনো আমাকে পরিষ্কার করে কিছু বলোনি।'

'বললে কি তুমি আমাদের দলে আসতে?' কমল স্পষ্ট জিজ্ঞেস করেছিল।

ফুল্লরা কিছুটা চিন্তিতভাবে মাথা নেড়েছিল, কারণ কমলকে মিথ্যা বলা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না, 'না, তা বলতে পারি না।'

'তুমি কি আমার আদর্শে বিশ্বাস কর?' কমল জিজ্ঞেস করেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'আমি তোমার আদর্শের মূলটাই জানি না।'

'আদর্শ সর্বহারার বিপ্লব। আপাতত সশস্ত্র কৃষিবিপ্লব, ক্ষমতা দখল। এখন আমার কাছে, ফ্যামিলি, সোসাইটি, স্টেট, আর সব পলিটিক্যাল পার্টিগুলো মূল্যহীন—সব মিথ্যা। এসবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব। অর্থহীন প্রয়োজনে বেঁচে থাকার থেকে মরাও ভালো। এখন যে সরকারকে বিপ্লবী সরকার বলা হচ্ছে, এটা একটা সোনার পাথর বাটির মতো।'

ফুল্লরা বলেছিল, 'যা আমি বুঝি না, তা নিয়ে তোমাকে কিছু বলতেও পারি না। তবে তোমার জন্য আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।'

কমল হেসেছিল, আর সেই হাসির পরেই বিদায়। ও কোথায় গিয়েছিল, এতকাল কী করছিল, ফুল্লরা কিছুই জানে না। কমলের কথা ভাবলেই নানান অশুভ কল্পনা ওর মনে জেগে উঠতো। জেল-খুন-খতম, শহরে বা গ্রামে, যার কোনোটাই ও সহজে মেনে নেওয়ার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি। অশুভ ভাবনার সঙ্গে কোথায় একটা হৃদয়ের সম্বন্ধ জড়িয়ে থাকে। কমলের সর্বত্যাগী দুঃসাহসের সঙ্গে একটা গৌরববোধও ওর মনে ছিল। আজ অকস্মাৎ এই সাক্ষাৎ কেবল ওকে চমকেই দেয়নি, মনে হচ্ছে, সেই বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তের কমলের সঙ্গে আজকের কমলের কোথায় যেন অমিল দেখা যাচ্ছে। লরি ড্রাইভারদের ঝোপড়িতে বসে' ওর কথাগুলো যেন ঠিক আগের কথার প্রতিধ্বনি না। আর কিছু, আরও কিছু

ঝোপড়ি থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে বসতে গিয়ে, দেখা গেল, সেই কাফ্‌কা-এর বইটা তেরো নম্বর আসনে পড়ে আছে। ফুল্লরা জানালার ধারে বসবার জন্য বইটা হাতে তুলে নিল। কমলের চোখে এখন সেই মুখোশ ধরনের ঠুলি। ফুল্লরা বইটা দেখিয়ে বললো, 'তুমি চলে যাবার পরে, তোমাদের তত্ত্ব নিয়ে একটু আধটু পড়াশোনার চেষ্টা করেছিলাম। সেই হিসাবে তোমার কাছে কাফ্‌কার বই দেখে একটু অবাক লাগছে।'

'কেন বলো তো?' কমলের কালো ঠুলিতে জিজ্ঞাসার ঝিলিক।

ফুল্লরা বললো, 'মার্কসিস্টের হাতে কাফ্‌কা, কোথায় যেন একটা সিনিসিজমের গন্ধ লাগছে।'

'প্রচলিত অর্থে সৈনিকদের বিশ্বনিন্দুক আর ব্যর্থই বলা হয় বটে।' কমল বললো, 'কিন্তু মনে রেখো, সিনিকরাই প্রথম সাম্যবাদী দার্শনিক। আর এ গোত্রের জনক ছিলেন এনটিস্থিনিস নামে এক ব্যক্তি, প্লেটোর সমসাময়িক। নিরাজ সমাজের যাঁরা কল্পনা করেছেন, তাঁদেরই নৈরাজ্য-বাদী বলা হয়েছে। অথচ, এখনকার পণ্ডিতদের মধ্যে নৈরাজ্যবাদী একটা গালাগাল। যদিও গালাগালটার প্রথম উচ্চারণ করেছিল, গ্রীসের নগরবাসী শাসকরা, তাদেব অনুচর দার্শনিকেরা। আমার ধারণা নিরাজ সমাজবাদের উৎস থেকেই বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদের জন্ম, যার সঙ্গে এমন কি গান্ধীবাদেরও কোথায় মিল আছে।' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে কমল হেসে উঠলো, 'সামান্য কথা থেকে অনেক কথা বলতে আরম্ভ করেছি। আসলে কী জানো, আমার চিন্তা-ভাবনায় নানারকম গোলমাল দেখা দিয়েছে। গোলমাল মানে, মূলকে জানা। তুমি সিনিক শব্দটা যতো সহজে বললে, যতো সহজে অনেকেই নৈরাজ্যবাদী বলে গালাগাল দেয়, আমি তারই প্রতিবাদ করতে চাইছিলাম। কাফ্‌কা আমার একজন প্রিয় লেখক।'

'বরাবরই ছিলেন ?' ফুল্লরার চোখে অবাক জিজ্ঞাসা।

কমল বললো, 'না, কিছুকাল ধরে। আর এই সব কারণেই, শ্যামলদের সঙ্গে আমার বিরোধ লাগছে। তোমাকে আগেই বলেছি, বিপ্লবী সরকারে আমার বিশ্বাস নেই, তারা কোনো লোকায়ত্ত রাষ্ট্রও গঠন করতে পারবে না। সেইজন্যই মার্কসবাদকে আমি আর ঠিক আগের চোখে দেখছি না। মনে হচ্ছে, যথার্থ না জেনেই, আমি একজন রাইফেলধারী হয়ে গেছি। মার্কসবাদের সঙ্গে আমাদের মূলতঃ কোথায় বিচ্ছেদ ঘটেছে, সেটা খুঁজে বের করা দরকার। এই কথাটা বলেই আমি দলের একটা অংশের শত্রু হয়ে গেছি। ফলে, দলের আর পুলিসের বন্দুক, দুই-ই আমার পিছনে ঘুরছে।' ও হাসলো।

ফুল্লরা আতঙ্কে শিউরে উঠলো, 'দল আর পুলিস দুইয়ের বন্দুক ?'

'হুঁ।' কমল একবার আশেপাশে তাকালো, 'দলে বিশ্বাস-ঘাতকদের স্থান তো নেই-ই। বেঁচে থাকার অধিকারও নেই। আর পুলিস তো বন্দুক উঁচিয়েই আছে। তোমাকে এসব বলাটা ঠিক হচ্ছে না অবিশ্যি।' ও হাসলো।

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করলো, 'কেন ? এটা নিষেধ ?'

'একরকম তো তাই।' কমল বললো, 'তা ছাড়া তোমার ভালোই বা লাগবে কেন ?'

ফুল্লরা ব্যগ্র স্বরে বললো, 'কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করছে। শ্যামলের সঙ্গে তোমার বিরোধ মানে, আমার কাছে মোটেই পরিষ্কার লাগছে না। শিবতোষদা ? তাঁর সঙ্গেও তোমার বিরোধ ?'

'নামগুলো উচ্চারণ করা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।' কমল বললো, 'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গেও আমাদের কিছু কিছু বন্ধুর মতবিরোধ হচ্ছে। গত দু মাস শহরে থেকে মতবিরোধ অনেক বেড়েছে। গ্রাম থেকে এখন শহরেহ খতম অভিযান বেড়েছে। শ্যামলও এখন কলকাতায়। হয়তো আমাকেও খুঁজছে।'

ফুল্লরা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। দলীয় জটিলতা, বিবাদের কথা ওর তেমন জানা ছিল না। ও যেন ঠিক ভাবতে পারছিল না, শ্যামল শিবতোষদার সঙ্গে কমলের কোনো বিরোধ হতে পারে। আর সেই বিরোধও প্রাণের বিনিময়ে মেটাতে হবে! ওর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এলো, 'তুমি তো তাহলে শাঁখের করাতের তলায় ?'

'বরাবরই ছিলাম।' কমল হাসলো, 'শহরে সশস্ত্র পুলিস, সাদা পোশাকের গোয়েন্দা, গ্রামে সশস্ত্র জোতদার আর তাদের পোষা গুণ্ডা।'

'কিন্তু পার্টির মধ্যে বিরোধ ?'

'এটা একটা অন্য উপসর্গ। মারবেই এমন কোনো কথা নেই, তবে পুলিসের হাতে তুলে দেবার চেষ্টা হয়েছে।'

'সেটা কী ভাবে?'

'পুলিসকে আমার আণ্ডারগ্রাউণ্ড ডেন জানিয়ে দিয়ে। আপাতত সেইজন্যই আমাকে ঘুর পথের ঠিকানায়, আবার দেশে ফিরে যেতে হবে।'

'কিন্তু বিরোধটা কিসের?'

'পথের। মতেরও কিছুটা বলতে পারো।'

'যথা?'

'আমাদের আসল তত্ত্ব থেকে বিচ্ছেদের কথাটা কেউ কেউ মানতে চাইছে না। অথচ, শহুরের ট্রেড ইউনিয়ন, যাকে আমরা বলেছি, লেবর অ্যারিস্টোক্র্যাসি, দরকষাকষির আন্দোলন, যার সঙ্গে বিপ্লব বিদ্রোহের কোনো যোগাযোগই নেই, এসব ছেড়ে আমরা গ্রামে চলে গেছলাম। আজকের শ্রমিক যন্ত্রেরই একটা অংশ, সে তার উৎপন্ন বস্তু হাতে করে ঘাঁটে না, তার কোনো মাথা ব্যথাও নেই। বলতে পারো সে এই যন্ত্রযুগের একটি উপযন্ত্র। মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের মিথ্যা বেড়াজাল থেকে এরা বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু গ্রামের কেবল ভূমিহীন কৃষক না, একজন দরিদ্র ভিক্ষুকও মাটি ঘাঁটতে ভালোবাসে। বঞ্চিত হয়েও একজন কৃষক তার ফলানো ফসল হাতে তুলে গন্ধ শোঁকে আর ক্ষুধায় হাহাকার করে। তারা কোনোকালেই নিতান্ত চাষের হাল বলদ লাঙ্গল হতে পারবে না, তাদের ফলানো ফসলের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর, অনেক বেশি মাটির প্রতি টান, অথচ সে সব সময় নিজের হাতে ফলানো ফসল থেকে বঞ্চিত। সেইজন্যই আমাদের পার্টি গোড়া থেকেই গ্রামকে বেছে নিয়েছিল, শহরকে নয়। কিন্তু কী রেজাল্ট হলো, বল।' কমলের দাড়ি গোঁফের ভাঁজে ব্যর্থ হাসির বিষণ্ণতা।

ফুল্লরা বললো, 'তোমাদের মতো আমাকে গ্রামে গিয়ে কৃষক দেখতে হয়নি বটে, কিন্তু তোমার কথা শুনে, তাদের যেন আমি নতুন করে দেখছি। রেজাল্ট কী হলো, আমাকে বল।'

'সে তো তুমি কাগজেও নিশ্চয় পড়েছ।' কমল বললো, 'সঠিক

ভাবে বলতে গেলে, আমাদের কোনো প্রস্তুতিই ছিল না, অথচ তার জন্য আমরা অপেক্ষা করতেও রাজী ছিলাম না। আমাদের সেই ধৈর্য কোথায় ছিল? আমরা কেবল ঝাঁপিয়ে পড়তেই চেয়েছিলাম। বুঝতে পারিনি, সেই থেকেই মূল তত্ত্ব থেকে আমাদের বিচ্ছেদ শুরু হয়েছিল। কৃষকদের যৌথ চেতনাকে আমরা জাগাতে পারিনি, আর এটাও বুঝতে পারিনি, দল বিপ্লব করে না, বিপ্লব ঘটায় জনতা। ফলে অতিবিপ্লব-বাদের কল্পনাবিলাস আমাদের পেয়ে বসলো, আমরা রোমান্টিকতার নামে হয়ে উঠলাম হৃদয়হীন। পুলিসের কাছে না, নিজেদের বন্ধু শ্রেণীর প্রতিই আমরা এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠলাম, আমাদের ডগমা এত বড় হয়ে উঠলো, আমরা জোর করে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে চাইলাম। তার ফলেই আমাদের গ্রাম ছাড়তে হয়েছে। আসলে গ্রাম আমাদের ছাড়ানো হয়েছে। অথচ শহরে এসে আমরা একটা মন্ত্রীকে মারতে পারিনি, পুলিসের আইজি বা কোনো কমিশনারকেও না। এমন কি কোনো ছদ্মবেশী নিখুঁত শত্রু শয়তানকেও না। মাঝখান থেকে শাসকদলের কতগুলো গুণ্ডা মস্তান এখন আমাদেরই দল ভাঙিয়ে খাচ্ছে, আমাদেরই মারছে, পুলিসের অনুচর ছাড়া তারা কিছুই নয়।' ও চুপ করলো, তাকালো আশেপাশে।

ফুল্লরার দৃষ্টি কোনো দিকেই নেই। ইতিমধ্যে বাইরে রোদ পশ্চিমে ঢল খেয়ে গিয়েছে। বাতাসের বেগ বেড়েছে, ওর চুল ঝাপটা খেয়ে গালে পড়ছে। বললো, 'তারপর? আমাকে বলো, আমার শুনতে ইচ্ছে করছে।'

'আর কী বলবো বলো?' কমল হাসলো, 'জীবনকে তুচ্ছ করতে পারি, কিন্তু কার্যকারণের কোনো কিছুই জিজ্ঞাসার অতীত হতে পারে না। আমরা যদি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীও গঠন করি, তবে তা বুর্জোয়াদের বিবেকহীন সামরিকবাহিনী হবে না। আমাদের অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে, জাগেনি শুধু তাদের, যারা কেবল তত্ত্ব থেকে না, জীবন আর জগৎ থেকেই যার আত্মবিচ্ছেদ ঘটে গেছে। প্রশ্ন জেগে-

ছিল বলেই, আমি দু মাস কলকাতায় শুধু পড়াশোনা করেছি। তার ফল হয়েছে এই, আমার মতামত আরও শক্ত হয়েছে, কিন্তু আমাদের পথ ভুল হয়েছে। ভুল কোথায়, সেটা আলোচনার বিষয়। আমরা নিজেরাই তা ঠিক করবো। তবে বিপ্লবী সরকার নয়। লোকায়ত্ত রাষ্ট্র চাই। পৃথিবীতে নিরাজসমাজবাদীরাই তার রূপরেখা ঠিক করে দিয়ে গেছেন। বিশ্বভ্রাতৃত্ব আর সাম্যের চিন্তা তাঁরাই প্রথম করেছিলেন। আমি পেছন ফিরে তাকাবার কথা বলছি না। কিন্তু গোড়া থেকে ভাবাই ঠিক। বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদকে জানতে হলেও, তার গোড়াও জানা দরকার।'

ফুল্লরা বললো, 'আমি এই নিরাজসমাজবাদের কথা তোমার কাছেই প্রথম শুনছি।'

'অথচ সাম্যের প্রাচীনতম স্বপ্ন এঁরাই দেখেছিলেন।' কমল বললো, 'কনফুসিয়াসের মন্ত্র ছিল শাসক আর নেতাদের মেনে নাও। কিন্তু তাঁরই সমসাময়িক লাওৎসেকে প্রকৃতিবাদী বললেও, আমি তাঁকে নিরাজ সমাজবাদীই বলবো, যা আমাদের শেষ লক্ষ। লাওৎসে তাঁর কথা কবিতায় বা ছড়া কেটে বলতেন। যেমন একটা তোমাকে শোনাই, "যতই বিধিনিষেধ বাড়বে, ততোই মানুষ হবে গরীব / যতো ধারালো হাতিয়ার বানাবে / রাজ্যে ততো বাড়বে বিশৃঙ্খলা / যতো কলাকৌশল ফাঁদবে / ততো বেরোবে তাকে এড়াবার ফন্দি / যে দেশে যতো আইনকানুন / সে-দেশে ততো চোর-ডাকাতের মেলা।" যীশু জন্মের অন্তত ছ'শো বছর আগে এসব কথা বলা হয়েছে।'

ফুল্লরা অবাক মুগ্ধস্বরে বলে উঠলো, 'আশ্চর্য, ঠিক যেন বর্তমানের কোনো হৃদয়বান দূরদর্শী কবির কবিতার মতো শোনাচ্ছে।'

'পুরীতে চলো, সমুদ্রের ধারে বসে তোমাকে এরকম অনেক আশ্চর্য কবিতা শোনাবো।' কমল হাসলো।

ফুল্লরা রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, 'আহ্, এবারের পুরী যাওয়াটা আমার সার্থক। কিন্তু একটা কথা খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে।'

'কী ?'

'ছ'মাস যে কলকাতায় ছিলে, তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ির কোনো যোগাযোগ হয়নি ?'

কমল আশেপাশে একবার দেখে বললো, 'যোগাযোগ হয়েছিল, কিন্তু বাড়ি যাইনি। সেখানে সবসময় নজর রাখা হয়। বাবা মা'র সঙ্গে আলাদা এক জায়গায় দেখা হয়েছিল।'

ফুল্লরা ব্যগ্র ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'কী বললেন তাঁরা ?'

'কী আর বলবেন ? ঘবের ছেলেকে ঘরে ফিরতে বললেন।' কমল হাসলো, 'আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতাও বাবার আছে।'

'গেলে না ?'

'কেন যাবো, কেমন করে যাবো ? ঘরে ফেরার জন্য তো আমি বেরোইনি।'

'কিন্তু আমি জানি, অনেকে ঘরে ফিরেছে।'

'আমি তাদের দলে নেই।' কমলের মুখে হাসি কিন্তু শক্ত অভিব্যক্তি, 'বাবা মা আবশ্যি বলেছিলেন, ইউ. কে. বা স্টেটস্-এ কোথাও চলে যেতে। ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। এমন কি বিয়ের কথাও বলেছিলেন। একেবারে নিশ্চিন্ত সুখের জীবন, কী বলো ?'

ফুল্লরা কিছু বললো না, বরং ওর চোখে মুখে যেন একটা স্বপ্নের মুগ্ধতা। কমল জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো ?'

ফুল্লবা যেন চমকিয়ে উঠে বললো, 'না। মানে, তাঁরা মন্দই বা কী বলেছেন। অনেক তো হলো, একটু না হয় নতুন করে দেখতে ?'

'অনেক আবার কী হলো ?' কমল অবাক হেসে বললো, 'হয়নি তো কিছুই। নতুন করে দেখার জায়গা তো আমাদের একটাই। সেখান থেকে আমি কোথাও যেতে পারি না।'

ফুল্লরা যেন ঘুমঘোরের বিস্ময়ে, কমলের চোখের কালো ঠুলির দিকে তাকিয়ে রইলো।

আঠারো ॥

'তোমার মুখে লাল আভা পড়েছে।' কমল বললো।

ফুল্লরা অবাক হলো, বাইরে তাকালো, হেসে বললো, 'বিকেলের আলো। তোমার মুখেও পড়েছে।'

দুজনের কথার মাঝখানেই, বাসের ভিতরে একটা ব্যস্ততা দেখা দিল। কয়েকজনের মুখে উচ্চারিত হতে শোনা গেল, 'ভুবনেশ্বর এসে গেছে।'

কমল ফুল্লরার দিকে ঝুঁকে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। দূরে আকাশের গায়ে একটি মন্দির চূড়া, আর শহরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। যাত্রীদের ব্যস্ততা আর মাল তোলা-পাড়া করতে দেখে বোঝা গেল, কেউ কেউ ভুবনেশ্বরেই নামবে।

'মনে হয়, পুরী পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।' ফুল্লরা বললো।

কমল তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিল না। কয়েক মুহূর্ত পরে, ভুবনেশ্বর শহরের চেহারা যতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো, ও হঠাৎ দ্রুত বললো, 'আমি ভুবনেশ্বরেই নেমে যাই। কিছুই বলা যায় না, পুরীতে হয়তো জাল পাতা আছে। অবিশ্যি থাকবেই, এমন কোনো কথা নেই। তবু সাবধানের মার নেই। কাল সকালের কোনো বাসে পুরী চলে যাবো, সমুদ্রের ধারে দেখা হবে।'

ফুল্লরা অবাক হয়ে বললো, 'হঠাৎ একেবারে ডিসিশন নিয়ে নিলে?'

'হ্যাঁ।' কমল নিচু হয়ে ওর বালিশের খোলের মতো লম্বা ব্যাগটার ভিতরে হাত দিয়ে চেপে, চেন টেনে বন্ধ করে দিল।

কণ্ডাক্টর তখন ঘণ্টা বাজিয়ে চিৎকার করছে, 'ভুবনেশ্বর এসে গেছে।'

গাড়ি আস্তে আস্তে দাঁড়ালো। কমল বাইরের দিকে দেখলো। ফুল্লরার দৃষ্টি কমলের দিকে। ভুবনেশ্বরের যাত্রীরা নামতে আরম্ভ করেছে। কমল ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কুমার আর অনুর দিকে ফিরে হাসলো, বললো, 'চলি।'

ফুল্লরা ঝটিতে কমলের পাঞ্জাবি টেনে ধরলো। কমল ফিরে তাকালো। ফুল্লরার মুখ রক্তশূন্য, চোখের ইশারায় বাইরের দিকে দেখালো। সেকেণ্ডের মধ্যেই, দেখা গেল, বাসের দুই দরজায়, সশস্ত্র পুলিস, রিভলবার হাতে দুজন অফিসার। প্রত্যেকটি যাত্রীর মুখের দিকে, পা থেকে মাথা পর্যন্ত, তীক্ষ্ণ চোখে খুঁটিয়ে দেখছে। কণ্ডাক্টর আর সহিস আগেই নেমে গিয়েছে। একজন সশস্ত্র পুলিস ড্রাইভারকে নেমে যেতে বললো। ড্রাইভার নেমে গেল। যাত্রীদের চোখে মুখে একটা সন্দেহ আর ভয়ের ছায়া। তারা পুলিস এবং পরস্পরকে দেখছে।

কমল আস্তে আস্তে বসে পড়লো। ওর হাত এখন বাঁ দিকে পাঞ্জাবির নিচে। ফুল্লরার সঙ্গে চকিতে একবার কুমার আর অনুর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিবিনিময় হলো। ইতিমধ্যে ভুবনেশ্বরের যাত্রীরা সবাই নেমে গিয়েছে। দুজন সশস্ত্র পুলিসকে নিয়ে, রিভলবার হাতে একজন অফিসার সামনের দরজা দিয়ে বাসের ভিতরে ঢুকলো। বুটের শব্দ বাসের পিছনের দরজায়ও। ফুল্লরা পিছন ফিরে দেখলো, একই সঙ্গে পিছন দিকেও সশস্ত্র পুলিস আর অফিসর উঠে এসেছে।

ফুল্লরা দরদর করে ঘামছে, বুকে দামামা বাজছে। পুলিস দু দিক থেকে ওদের সামনে পিছনে এসে দাঁড়ালো। কমলের কালো ঠুলি পরা মূর্তি পাথরের।

'কমলবাবু। উঠুন।' ঠিক পিছনের সীট থেকেই, সেই সমালোচক বয়স্কদের একজন বলে উঠলো।

ফুল্লরার বুকে যেন ছুরি বিঁধে গেল। লোক দুটোই গোয়েন্দা?

কলকাতা থেকেই অনুসরণ করছে। কমল পিছন ফিরে দেখলো, কিছু বললো না। সামনের অফিসার রিভলভার তুলে, পরিষ্কার বাংলায় বললো, 'নেমে আসুন।'

কমল উঠে দাঁড়ালো। কারোর দিকে তাকালো না। এমন কি ফুল্লরার দিকেও না। ফুল্লরা কিছু বলে উঠতে যাচ্ছিল, কুমার ডেকে উঠলো, 'ফুলু, তুমি এদিকে চলে এসো।'

কমল সামনের দরজার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। ওর বাঁ হাত এখন পাঞ্জাবির বাইরে ঝুলছে। ডান কাঁধে ব্যাগ। ফুল্লরা কুমারের কথা শুনতে পেলো, কিন্তু কমলের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলো না। পিছনের আসনের লোক দুটোও উঠলো। সমস্ত বাস স্তব্ধ।

ফুল্লরা দেখছে, কমল বাস থেকে নামলো। ফুল্লরার ঠোঁট কাঁপছে, কথা বলতে পারছে না, গলার কাছে যেন শক্ত কিছু ঠেকে আছে। ঠিক এই মুহূর্তেই চকিতে ঘটনাটা ঘটলো। কমল ওর কাঁধের ব্যাগটা চোখের পলকে অফিসারের রিভলভার ধরা হাতের উপর ছুঁড়ে মারলো। শুধু অফিসারের রিভলভারটা পড়ে গেল না, লোকটা বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে সরে গেল। একজন সশস্ত্র পুলিস কাছে থেকে রাইফেল বাগাবার আগেই, কমলের হাতে রিভলভার ঝলকিয়ে উঠলো। একটা গুলি ছুঁড়েই লাফ দিয়ে, বাসের ডানদিকে মোড় নিয়ে ছুটলো। স্পষ্টতই কমল কারোকে মারবার জন্য গুলি ছোঁড়েনি। একটা চমক লাগিয়ে, পরিস্থিতিটা ওলটপালট করে দিয়ে, পালানোটাই যেন ওর উদ্দেশ্য ছিল।

ফুল্লরা সব কিছু ভুলে গিয়ে, ডান দিকের জানালায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। বাইরে তখন পুলিসের চিৎকার। বুটের ছুটোছুটির শব্দ। ফুল্লরা দেখতে পেল, কমল বাসের পিছন দিকে দৌড়োচ্ছে। হঠাৎ পর পর কয়েকটা গুলির শব্দ, ফুল্লরা চিৎকার করে উঠলো, 'না না…।'

কমল তখন রাস্তার মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়েছে। ওর সামনে একটা গর্জমান জীপ। চারপাশে সশস্ত্র পুলিসের বেষ্টনীতে কমলকে

আর দেখা যাচ্ছে না। ফুল্লরার মাথা ঠুকে গেল বাসের জানালায়, ও একবার চিৎকার করতে গেল। অনু ওকে নিজের বুকে টেনে নিল।

আবার একদল সশস্ত্র পুলিস ছুটে এসে বাসের মধ্যে ঢুকলো। এক দরজা দিয়ে ঢুকে, আর এক দরজা দিয়ে নেমে যাবার আগে, সকলের মুখের দিকে দেখলো। আফিসার একবার অনুদের আসনে সামনে দাঁড়ালো, দেখলো ফুল্লরাকে, বললো, 'শকৃড ?' কোনো জবাবের প্রত্যাশা না করেই নেমে গেল।

ড্রাইভার গাড়িতে উঠে এঞ্জিনে স্টার্ট দিল। কণ্ডাক্টর আর সহিস উঠে দুদিক থেকে দরজা বন্ধ করলো। বাইরে থেকে হুকুম শোনা গেল, 'ছোড়।'

বাস গর্জন করে ছুটলো। ভিতরে তখনো স্তব্ধতা। কেবল কণ্ডাক্টরের গলা শোনা গেল, 'একদম ঝাঁজরা করে দিয়েছে।' তার দৃষ্টি ফুল্লরার দিকে।

ফুল্লরার কানে বাজছে, 'সমুদ্রের ধারে দেখা হবে। সমুদ্রের ধারে……।'

'ফুলু।' কুমার ডাকলো।

ফুল্লরা উঠে দাঁড়ালো। সকলের দৃষ্টিই এখন ওর দিকে। পিছনের আসনে সেই লোক দুটো নেই। ফুল্লরা আঁচল দিয়ে চোখ মুখ মুছলো। না, ও কাঁদতে পারছে না। ও তেরো নম্বর আসনে গিয়ে বসলো। বাইরের দিকে তাকিয়ে ও শহর দেখছে না। ও দেখছে, সমুদ্রের ধার দিয়ে কমল হেঁটে চলেছে, উজ্জ্বল চোখে হাসির দ্যুতি। হাজার হাজার বছর আগের নিরাজবাদী সমাজের কবিতা বলছে, আর হাসছে ধ্বনি শোনো যাচ্ছে, বাণী বোঝা যাচ্ছে না।

সমুদ্র প্রচণ্ড হয়ে তীরে আছড়ে পড়ছে, আর ফেনপুঞ্জ হাসিতে খলখল করছে।

——